প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচারিক ব্যবস্থাঃ পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

(উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান)

Training Manual on

Laws, Policies, Institutions and Judiciary: Contexts of Environment, Ecosystems, Natural Resource Management, Climate Change and Disaster Management

অক্টোবর, ২০১৪

সহযোগিতায় : ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস অ্যান্ড লাইভলিহুড্‌স (ক্রেল), ইউএসএআইডি

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচারিক ব্যবস্থা: পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

(উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান)

Training Manual on

Laws, Policies, Institutions and Judiciary: Contexts of Environment, Ecosystems, Natural Resource Management, Climate Change and Disaster Management

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচারিক ব্যবস্থাঃ পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

প্রকাশক	ঃ	ইউএসএআইডি ক্রেল প্রকল্প এবং সহযোগিতায় বন, মৎস্য ও পরিবেশ অধিদপ্তর
সংকলন ও প্রণয়নে	ঃ	মুহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম খান এবং শারাবান তাহুরা জামান (Lawyers, Center for Climate Justice- Bangladesh)
সম্পাদনা	ঃ	এম. এ. ওয়াহাব সাজিয়া মহসিন খান এ কে এম শামসুদ্দিন ডঃ গোলাম মুস্তফা সৈয়দ মুহাম্মাদ শাহ জালাল শরফ উদ্দিন আহম্মদ
সার্বিক সহযোগিতায়	ঃ	জন এ ডর উৎপল দত্ত
প্রথম প্রকাশনা	ঃ	নভেম্বর, ২০১৪
প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন	ঃ	ইমতিয়াজ আহমেদ সজল

কপিরাইট	ঃ	ক্রেল প্রকল্প

মুখবন্ধ

বিবিধ পরিবেশ এবং প্রতিবেশগত কারণে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বাংলাদেশের ৩৬টি রক্ষিত বন, জলাভূমি এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জীববৈচিত্র্যের হুমকিসমূহ হ্রাস এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর সাথে অভিযোজন ঘটানোর লক্ষ্যে ২০১২ সাল থেকে ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় জলবায়ু সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকায়ন (ক্রেল) প্রকল্প বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তরের এবং মৎস্য অধিদপ্তর সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ক্রেল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান সমূহ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বন ও জলাভূমির সম্পদ সমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত পরিকল্পনা ও জীবিকা বহুমুখীকরণের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তোলা।

দেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিকসম্পদ রক্ষার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রণয়ন করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষ, বিশেষ করে এ সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে অনেকেরই আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এই প্রেক্ষাপটে মূলত **উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণকে** পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কি কি আইন ও নীতি আছে, প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারা, বিচারিক ব্যবস্থা কেমন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটিতে তথ্যের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এছাড়া এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মাধ্যমে তাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিকসম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রচলিত আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচার ব্যবস্থাসম্পর্কেও ধারণা দেওয়া যাবে।

ম্যানুয়ালটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটিতে উপস্থাপিত আইন, নীতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, উপকরণ ও প্রক্রিয়াসমূহ খুব সহজ, সাধারণ এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যাতে করে একজন প্রশিক্ষক সহজে বুঝে উঠতে পারে এবং স্বাচ্ছন্দ্যতার সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারে। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি অধিবেশনসহ আরও সাতটি বিষয় ভিত্তিক অধিবেশনের মাধ্যমে দুই দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছে।

আশা করি এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি অনুসরণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালিত হলে তা দেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকে উজ্জীবিত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং প্রশিক্ষণার্থিদেরকে নিজ নিজ এলাকায় আইন সমূহের সঠিক প্রয়োগে সহযোগিতা করতে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে সহায়তা প্রদান করবে।

এই ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করেছেন আইনবিদ মুহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম খান। আর সম্পাদনায় ক্রেল প্রকল্পের এম. এ. ওয়াহাব, সাজিয়া মহসিন খান, এ কে এম শামসুদ্দিন, ড: গোলাম মুস্তফা, সৈয়দ মুহাম্মাদ শাহ জালাল এবং শরফ উদ্দিন আহম্মদ সহযোগিতা করেছেন। ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন ও সম্পাদনায় সহায়তা প্রদানকারীদের কর্ম প্রয়াসের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জন এ ডর, পিএইচডি
ডেপুটি চিফ অফ পার্টি
ক্রেল প্রকল্প

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এবং মূল বিষয়বস্তু

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যঃ

প্রশিক্ষণ কর্মশালাটির অংশগ্রহণকারী হবে উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় সরকার (উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ) প্রতিনিধিগণ। এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করার পূর্বে প্রণয়নকারী আইনজীবীগণ, প্রস্তাবিত অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছেন। প্রস্তুতকারী আইনজীবীগণ উক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রথমত আইনি সমস্যা চিহ্নিত করে এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটিতে তৎসম্পর্কিত আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেছেন। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি অধিবেশনসহ আরও সাতটি বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনের মাধ্যমে দুই দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছে। সাতটি বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনগুলো হচ্ছে: বাংলাদেশের আইন, নীতি ও বিচার ব্যবস্থা; পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা; বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা; জল, জলাভূমি ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা; সহ-ব্যবস্থাপনা এবং গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা; জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং নারীর অংশগ্রহণ ।

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কী কী আইন ও নীতি আছে, প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারা, বিচারিক ব্যবস্থা কেমন ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারবে। আরো জানতে পারবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচার ব্যবস্থা। দেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রণয়ন করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষ, বিশেষ করে এ সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে অনেকেরই আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এই প্রেক্ষাপটে এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালা গুলো দেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখিবে এবং এ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে নিজ নিজ এলাকায় ভূমিকা পালনে উদ্যোগী করিবে।

প্রশিক্ষণের মূল বিষয়সমূহ:

- বাংলাদেশের আইন, নীতি ও বিচার ব্যবস্থা;
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনায় আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচার ব্যবস্থা ;
- বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা;
- জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা;
- সহ-ব্যবস্থাপনা এবং গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা;
- জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা;
- পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং নারীর অংশগ্রহণ: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা।

প্রশিক্ষকের করনীয়

- এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি, একটি সাহায্যকারী গাইডলাইন বিশেষ। একজন দক্ষ প্রশিক্ষক এটিকে তার নিজের আয়ত্তে এনে নিজের মত করে ব্যবহার করবেন;

- যদিও প্রশিক্ষক যথেষ্ট অভিজ্ঞ তথাপি ব্যবহার করার পূর্বে পুরো ম্যানুয়ালটি অবশ্যই কয়েকবার পড়ে নেওয়া আবশ্যক। বিশেষ করে সংযুক্ত হ্যান্ডআউট গুলো সতর্কতার সাথে পড়ে নেওয়া উচিত। সংযুক্ত আইন ও বইয়ের তালিকার সহযোগিতা নিয়ে প্রশিক্ষক নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেন;

- প্রতিটি অধিবেশনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া যুক্ত করা হইয়াছে। সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এসব পরীক্ষিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহ সংযুক্ত করা হইয়াছে। তারপরও প্রশিক্ষক কর্তৃক স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর ভিন্নতা আনা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে প্রশিক্ষক যথাযথ কৌশল নিবেন। প্রশিক্ষক তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মূল বিষয় অক্ষুণ্ন রেখে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে নিতে পারেন;

- প্রশিক্ষণ ও পাঠের সফলতা মূল্যায়ন করা প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারী উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজেই প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে শিখন যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।

- যদি প্রশিক্ষণ সংগঠকগণ প্রশিক্ষকদের জন্য কোন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বা প্রশিক্ষণপূর্ব কৌশলগত আলোচনা কর্মসূচি আয়োজন করেন, প্রশিক্ষকদের এ সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা, এসব কর্মসূচি তাদের জন্য আইন ও নীতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহায়ক হবে।

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে আলোচিত আইন, বিধি, নীতি ও কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ

আইন

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২
- The General Clauses Act, 1897
- The Code of Criminal Procedure, 1898
- The Code of Civil Procedure, 1908
- The Civil Courts Act, 1887 (Amendment, 2001)
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)
- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩
- পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০
- মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০
- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩
- বন আইন, ১৯২৭
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২
- নগর উন্নয়ন আইন, ১৯৫৩
- The Bangladesh Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958
- The Prevention of Interference with Aids to Navigable Waterways Ordinance, 1962
- বন্দর আইন, ১৯০৮
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০
- ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০
- বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০
- দণ্ডবিধি, ১৮৬০
- মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০
- দি মেরিন ফিশারিজ অর্ডিনেন্স, ১৯৮৩
- দি প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিস (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২
- দি প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিস (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০২
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০
- জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২
- মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯
- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯
- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯
- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯
- উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮
- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬
- The Evidence Act, 1872
- The Oaths Act, 1873

বিধি

- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭
- বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২
- করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২
- সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধনী, ২০১০)
- The Prevention of Interference with Aids to Navigable Waterways Rules, 1973
- মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫

নীতি

- পরিবেশ নীতি, ১৯৯২
- বন নীতি, ১৯৯৪
- মৎস্য নীতি, ১৯৯৮
- পানি নীতি ১৯৯৯
- উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫
- খাদ্য নীতি, ২০০৬
- সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯
- নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১
- কৃষি নীতি, ২০১৩

কর্ম-পরিকল্পনা

- ন্যাশনাল এডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশান (NAPA), ২০০৫
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম-পরিকল্পনা (BCCSAP), ২০০৯
- জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশলগত কর্ম-পরিকল্পনা, ২০০৪
- Bangladesh Poverty Reduction Strategy Paper, 2009

প্রশিক্ষণ অধিবেশন সূচি

প্রশিক্ষণের মেয়াদঃ দুই দিন

১ম দিনঃ

সময়	অধিবেশন	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
৯.৩০-১০.১০	**প্রারম্ভিক অধিবেশন:** সূচনামূলক আলোচনা	সূচনামূলক আলোচনা ও নিবন্ধন	নিবন্ধন ফরম	ফেসিলিটেটর
		জড়তা ভঙ্গ ও পরিচয় পর্ব	দ্বৈত বা একক পরিচয় পর্ব	সরকারি প্রতিনিধি, ফেসিলিটেটর
		প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও ম্যানুয়ালের কাঠামো	লেকচারেট, প্রদর্শন	ফেসিলিটেটর
		প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	ফেসিলিটেটর
		প্রশিক্ষণ উপকরণ	ফ্লিপ চার্ট, প্রদর্শন, আলোচনা	ফেসিলিটেটর
		প্রশিক্ষণ প্রত্যশা	আলোচনা	ফেসিলিটেটর
১০.১০-১১.০০	**প্রথম অধিবেশন:** বাংলাদেশের আইন, নীতি এবং আদালত ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১.১ আইন ও নীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		১.২ আদালত ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
১১.০০-১১.৩০	**চা- বিরতি**			
১১.৩০-১.০০	**দ্বিতীয় অধিবেশন :** পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচার ব্যবস্থা	২.১ বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও দূষণ	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		২.২ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষায় আইন, নীতি ও কেইস স্টাডিজ সমূহ	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		২.৩ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		২.৪ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং বিচারিক ব্যবস্থা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
১.০০-২.০০	**মধ্যাহ্নভোজের বিরতি**			
২.০০-৩.৩০	**তৃতীয় অধিবেশন:** বন, বন্যপ্রাণী ও	৩.১ বাংলাদেশের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা	দলভিত্তিক আলোচনা ও	ফেসিলিটেটর

সময়	অধিবেশন	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
	জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা		তা উপস্থাপন	
		৩.২ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা এবং আইন, নীতি ও কেইস স্টাডি	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৩.৩ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৩.৪ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য এবং বিচারিক ব্যবস্থা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
৩.৩০-৪.০০	চা বিরতি			
৪.০০-৫.৩০	**চতুর্থ অধিবশন:** জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা	৪.১ বাংলাদেশের জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৪.২ জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি ও কেইস স্টাডি	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৪.৩ জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৪.৪ জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বিচারিক ব্যবস্থা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর

২য় দিনঃ

সময়	অধিবেশন	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
৯.৩০-১১.০০	**পঞ্চম অধিবেশন:** সহ-ব্যবস্থাপনা এবং গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা	৫.১ সহ-ব্যবস্থাপনা ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৫.২ সহ- ব্যবস্থাপনা ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি ও কেইস স্টাডি	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৫.৩ সহ- ব্যবস্থাপনা ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৫.৪ সহ- ব্যবস্থাপনা ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: বিচারিক ব্যবস্থা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
১১.০০-১১.৩০	চা বিরতি			

সময়	অধিবেশন	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
১১.৩০-১.০০	**ষষ্ঠ অধিবেশন:** জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা	৬.১ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৬.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, কৌশলসমূহ ও কেস স্টাডি	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৬.৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৬.৪ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: বিচারিক ব্যবস্থা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
১.০০-২.০০	**মধ্যাহ্নভোজের বিরতি**			
২.০০-৩.৩০	**সপ্তম অধিবেশন:** পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং নারীর অংশগ্রহণ: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা	৭.১ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৭.২ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার: আইনি বিধানসমূহ	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৭.৩ স্থানীয় সরকার এবং বিচারিক ব্যবস্থা	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৭.৪ স্থানীয় সরকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
		৭.৫ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নারীর ভূমিকা এবং আইন ও নীতি	দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন	ফেসিলিটেটর
৩.৩০-৪.০০	**চা বিরতি**			
৪.০০-৫.৩০	**সমাপ্তি অধিবেশন:** আইন জিজ্ঞাসা, প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও সমাপ্তি ঘোষণা	আইন জিজ্ঞাসা	প্রশ্ন উত্তর এবং আলোচনা	ফেসিলিটেটর
		প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা	মূল্যায়ন ফরমেট	ফেসিলিটেটর
		সমাপ্তি ঘোষণা	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা	ফেসিলিটেটর

সূচিপত্র

দিবস	অধিবেশন	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রারম্ভিক অধিবেশন: সূচনামূলক আলোচনা	সূচনামূলক আলোচনা ও রেজিস্ট্রেশন	১
		জড়তা ভঙ্গ ও পরিচয় পর্ব	১
		প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও ম্যানুয়ালের কাঠামো	২
		প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	২
		প্রশিক্ষণ উপকরণ	৩
		প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা	৪
	প্রথম অধিবেশন: বাংলাদেশের আইন, নীতি ও আদালত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১.১ আইন ও নীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৬
		১.২ আদালত ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৯
	দ্বিতীয় অধিবেশন: পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচার ব্যবস্থা	২.১ বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও দূষণ	১৪
		২.২ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষায় আইন, নীতি ও কেইস স্টাডিজ	১৫
		২.৩ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৩১
		২.৪ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং বিচারিক ব্যবস্থা	৩৪
	তৃতীয় অধিবেশন: বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা	৩.১ বাংলাদেশের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা	৪৪
		৩.২ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা এবং আইন, নীতি ও কেইস স্টাডি	৪৫
		৩.৩ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৬৫
		৩.৪ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য এবং বিচারিক ব্যবস্থা	৬৯
	চতুর্থ অধিবশন: জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা	৪.১ বাংলাদেশের জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৭৬
		৪.২ জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি ও কেইস স্টাডি	৭৭
		৪.৩ জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৯৩
		৪.৪ জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বিচারিক ব্যবস্থা	৯৪

	পঞ্চম অধিবেশন: সহ-ব্যবস্থাপনা এবং গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা	৫.১ সহ-ব্যবস্থাপনা ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৯৮
		৫.২ সহ- ব্যবস্থাপনা ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি ও কেইস স্টাডি	৯৯
		৫.৩ সহ- ব্যবস্থাপনা ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১১৪
		৫.৪ সহ- ব্যবস্থাপনা ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: বিচারিক ব্যবস্থা	১১৪
২	**ষষ্ঠ অধিবেশন:** জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা	৬.১ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১১৬
		৬.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, কৌশলসমূহ ও কেস স্টাডি	১১৮
		৬.৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১৩৩
		৬.৪ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: বিচারিক ব্যবস্থা	১৩৪
	সপ্তম অধিবেশন: পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং নারীর অংশগ্রহণ: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচারিক ব্যবস্থা	৭.১ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা	১৩৫
		৭.২ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার: আইনি বিধানসমূহ	১৩৬
		৭.৩ স্থানীয় সরকার এবং বিচারিক ব্যবস্থা	১৩৭
		৭.৪ স্থানীয় সরকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১৩৯
		৭.৫ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নারীর ভূমিকা এবং আইন ও নীতি	১৩৯
	সমাপ্তি অধিবেশন: আইন জিজ্ঞাসা, প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও সমাপ্তি ঘোষণা	আইন জিজ্ঞাসা,	১৪৩
		প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা	১৪৩
		সমাপ্তি ঘোষণা	১৪৩

প্রারম্ভিক অধিবেশন	সূচনামূলক আলোচনা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা

১. একে অপরের সাথে পরিচিতির সুযোগ পাবেন;
২. পারস্পরিক যোগাযোগের বাধাগুলি অতিক্রম করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন;
৩. একটি জড়তা মুক্ত আনন্দদায়ক অংশগ্রহণমূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে;
৪. এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাবেন।

পদ্ধতি ঃ নিবন্ধন ফরম, লেকচারেট, প্রদর্শন, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ ঃ হ্যান্ডআউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার পেন, পোস্টার, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন, হোয়াইট বোর্ড, কম্পিউটার ইত্যাদি।

সময় ঃ ৪০ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ

সূচনামূলক আলোচনা ও রেজিস্ট্রেশন:

- প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানাবেন;
- একটি অংশগ্রহণকারী তালিকা ফরম পূরণ করবেন যেখানে অংশগ্রহণকারীরা স্বাক্ষর করবেন;
- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের ধরণ সম্পর্কে বলবেন। পুরো প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হবে অংশগ্রহণমূলক বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে;
- প্রশিক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা;
- প্রশিক্ষক বলবেন- এখানে আমরা সকলে মিলে প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এবং আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের নিকট থেকে শিখতে চেষ্টা করবো। কারণ আমাদের সকলেরই নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে;
- প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের নাম ও সময়কাল বোর্ডে স্পষ্ট করে লিখবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের তা রপ্ত করানোর চেষ্টা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খাতা, কলম ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করবেন;
- অতঃপর প্রশিক্ষক পুনরায় সকলকে আলোচনায় সক্রিয় থাকার অনুরোধ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

জড়তা ভঙ্গ ও পরিচয় পর্ব:

পরিচয় পর্বকে আনন্দঘন ও সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আর্ট পেপারে যে কোন ছবি (ফুল, ফল, মাছ ইত্যাদি) অঙ্কন করে কাঁচি দিয়ে সমান দুই অংশে ভাগ করে, কেটে নিতে হবে। অধিবেশন শুরুর আগেই ছবির বিভিন্ন অংশগুলো কাগজের বাক্সে সংমিশ্রণ করে রাখুন। পরিচয় পর্ব শুরু হওয়ার আগে কাগজের বাক্সে মিশ্রিত অঙ্কিত ছবির খণ্ডগুলি সবার মাঝে বিতরণ করুণ। অংশগ্রহণকারীরা অঙ্কিত ছবির এক অংশ পাওয়ার পর আরেক অংশ অন্যের সাথে জোড়া মেলানোর তাগিদ শুরু হবে। মিলিত ছবির জোড়াই হবে একে অপরের বন্ধু। এভাবে সকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে জোড়া জোড়া বন্ধু হবে।

তারা একে অপরের কাছ থেকে বন্ধু সম্পর্কে জানবেন (নাম, জন্মস্থান, কর্মস্থল, শিক্ষাগতযোগ্যতা ইত্যাদি) এরপর সকল অংশগ্রহণকারী নিজ নিজ আসনে বসবেন। এরপর প্রশিক্ষক জোড়া বন্ধুদের সবার সামনে ডাকবেন এবং একে অপরের জোড়া বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিতে বলবেন। এভাবে পরিচয় পর্ব শেষ হবে। অবশ্য পরিচয় পর্ব অন্যভাবেও শেষ হতে পারে, যেমন- বড় দলে এক এক করে নিজের পরিচয় নিজে দিতে পারে। পর্ব শেষ হলে পরবর্তী অধিবেশনে সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাবেন।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও ম্যানুয়ালের কাঠামোঃ

প্রশিক্ষণ কর্মশালাটির অংশগ্রহণকারী হবে উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় সরকার (উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ) প্রতিনিধিগণ এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটি প্রস্তুত করার পূর্বে প্রস্তুতকারী আইনজীবীগণ, প্রস্তাবিত অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছেন। প্রস্তুতকারী আইনজীবীগণ উক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রথমত আইনি সমস্যা চিহ্নিত করে এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটিতে তৎসম্পর্কিত আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেন। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটি প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি অধিবেশনসহ আরও সাতটি বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনের মাধ্যমে দুই দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার কাঠামো প্রস্তুত করা হইয়াছে। সাতটি বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের আইন, নীতি ও বিচার ব্যবস্থা; পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা; বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা; জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা; সহ-ব্যবস্থাপনা এবং গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা; জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং নারীর অংশগ্রহণ ।

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটি থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কী কী আইন ও নীতি আছে, প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারা, বিচারিক ব্যবস্থা কেমন ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারবে। আরো জানতে পারবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং নারীর অংশগ্রহণ সর্ম্পকে আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচার ব্যবস্থা । দেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রণয়ন করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষ, বিশেষ করে এ সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে অনেকেরই আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এ বিবেচনায় এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটি এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালা গুলো দেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিবে এবং এ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ এলাকায় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতিঃ

প্রধানত অংশগ্রহণমূলক আলোচনা পদ্ধতিতে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি পরিচালিত হবে। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে ঝড়ো ভাবনা (Brain storming), ছোট ও বড় দলীয় আলোচনা, প্রদর্শন, রোলপ্লে, কেইস স্টাডি, প্রশ্নোত্তর ও গ্রুপ ডিসকাসন ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন আইন, নীতি ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ধারণা দেয়া হবে।

প্রশিক্ষণ উপকরণঃ

প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হবে ফ্লিপ চার্ট, হ্যান্ডআউট, পোস্টার, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন, কম্পিউটার, হোয়াইট বোর্ড, নোটবুক ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ সহায়ক উপকরণ

অংশগ্রহণকারীদের নাম নিবন্ধনকরণ ছক

প্রশিক্ষণ স্থানঃ তারিখঃ সময়ঃ

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবি	প্রতিষ্ঠান	মোবাইল নম্বর/ ই-মেইল	স্বাক্ষর

প্রশিক্ষণ প্রত্যাশাঃ

প্রশিক্ষক ফ্লিপবোর্ডের উপর একটি পোস্টার কাগজ লাগিয়ে নিবেন। প্রশিক্ষক এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা কি তা জানতে চাইবেন। আসলে এখানে কি চাওয়া হচ্ছে তা অংশগ্রহণকারীদের ভালভাবে বুঝিয়ে বলবেন।

অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা নিম্নরূপ হতে পারে:

- পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা; বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা; জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা; জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; সহ- ব্যবস্থাপনা এবং গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা; এবং পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তি।

এরপর সহায়ক পোস্টারে লিখিত প্রত্যাশাগুলো অংশগ্রহণকারী একজনকে দিয়ে পাঠ করাবেন। পোস্টারটি প্রশিক্ষণ কক্ষের দৃশ্যমান কোন স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখিবেন।

প্রথম অধিবেশন	বাংলাদেশের আইন, নীতি ও আদালত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা

১. বাংলাদেশের আইন ও নীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাবেন;

২. এছাড়াও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা আদালত ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

উপকরণ ঃ হ্যান্ডআউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার পেন, পোস্টার, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন, হোয়াইট বোর্ড, কম্পিউটার ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন।

সময় ঃ ৫০ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ

প্রশিক্ষক এই অধিবেশনে-

- অধিবেশনের শুরুতে প্রশিক্ষক বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিবেন;
- এরপর প্রশিক্ষক আইন, নীতি, আদেশ, বিধিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লিগ্যাল টার্ম এর সংজ্ঞা এবং এর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরবেন;
- প্রশিক্ষক এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশের বিচার বাবস্থা, আদালতের কাঠামো ও এখতিয়ার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিবেন;
- এই অধিবেশনের বিষয়বস্তু প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে সহজ বোধ্য করার মাধ্যমে প্রশিক্ষক পরবর্তী অধিবেশনের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

১. বাংলাদেশের আইন, নীতি এবং আদালত ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই অধ্যায় মূলত প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা সর্ম্পকে একটি প্রাথমিক ধারণা দিবে। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে, বাংলাদেশের বিচার ও আদালত ব্যবস্থার ক্রম ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলঃ

- বাংলাদেশের বর্তমান আইন ব্যবস্থা পাক-ভারত উপমহাদেশের ২০০ বছর ধরে প্রচলিত ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার কাছে বহুলাংশে ঋণী যদিও ব্রিটিশ আদালত ব্যবস্থার কিছু কিছু অংশ প্রাচীন হিন্দু এবং মুঘল শাসন ব্যবস্থা থেকে এসেছে;
- ইহা বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ক্রমান্বয়ে একটি চলমান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় রূপ লাভ করেছে। এই বিবর্তন প্রক্রিয়াটি আংশিকভাবে প্রাচীন এবং আংশিকভাবে বিদেশি;
- বর্তমান আইন ব্যবস্থার একটি মিশ্র পদ্ধতি থেকে উৎসারিত যা ইন্দো, মুঘল এবং ইংলিশ আইন ব্যবস্থার গঠন, আইনগত মূলনীতি এবং মতবাদ দ্বারা ঢেলে সাজানো হয়েছে;

- হিন্দু ও মুসলিম আমল এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমলসহ পাক-ভারত উপমহাদেশের পাঁচশত বছরের অধিক সময়ের ইতিহাস বিদ্যমান এবং প্রত্যেকটি শাসনামলের একটি স্বতন্ত্র আইন ব্যবস্থা ছিল;
- বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো সহজে অনুধাবনের জন্য এগুলোকে হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ, ব্রিটিশ যুগ, পাকিস্তান আমল এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ আমল এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে;
- হিন্দু যুগে বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজাই ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং ন্যায়বিচারের উৎসরূপে রাজাকেই বিবেচনা করা হত। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজাকে বিজ্ঞ ব্রাহ্মন, প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ, মন্ত্রিবর্গ, প্রবীণ ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সহায়তা করতেন;
- মুসলিম যুগেও রাজাই ছিলেন বিচার ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা। কিন্তু বিচার ব্যবস্থার প্রশাসনিক শ্রেণি বিভক্তি এ সময় থেকেই গড়ে উঠেছিল। আদালতগুলো একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণি বিভাগসহ বিভিন্ন ধাপে রাজধানী, প্রদেশ, জেলা, পরগনা এবং গ্রামে গড়ে উঠেছিল। এছাড়া প্রতিটি আদালতের ক্ষমতা এবং এখতিয়ারও সুনির্দিষ্ট ছিল। এ যুগে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার এর জন্য আলাদা আদালতের ব্যবস্থা করা হয়। মূলত কোরআনের বিধান অনুসারেই বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করা হত;
- প্রাচীন ভারতীয় আইনের আধুনিকায়ন ঘটে ব্রিটিশদের হাতে যারা বাণিজ্যিক কোম্পানি হিসেবে রয়েল চার্টারের (১৭২৬) মাধ্যমে এদেশে আগমন করে। ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করা হয় । ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৮৬১ সালে Indian High Courts Act পাস করার মাধ্যমে তিনটি Presidency শহরে হাইকোর্ট স্থাপিত হয় । এসময় তিনটি একক সংহিতা বিধিবদ্ধ করা হয় (দেওয়ানি কার্যবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং দণ্ডবিধি), এছাড়া ১৮৮৭ সালে Civil Courts Act পাশ করা হয়;
- বাংলাদেশের বর্তমান দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত অবকাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থার ভিত্তি এখনও দেওয়ানি কার্যবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি ও Civil Courts Act নির্ভরশীল। এছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধান Supreme Court এর গঠন প্রকৃতির মূল আইন। বাংলাদেশের আইন ও বিচারিক ব্যবস্থা যদিও সময় এর পরিবর্তনের সাথে স্বতন্ত্র অবকাঠামোতে উপনীত হইয়াছে, তবুও আইনি মূলনীতির (legal Principal) ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও ব্রিটিশ কমন ল'কে অনুসরণ করে।

১.১. আইন, নীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

- **আইন (*Law*)**

সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে 'আইন' অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশের আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতিকে বোঝায়। সহজ ভাষায় আইন বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কিছু নিয়মের সমষ্টি বোঝায় যার মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং নাগরিকদের মাঝে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই আইন যখন পার্লামেন্টে পাশ হয় তখন তাকে বলা হয় Act।

- **অধ্যাদেশ (*Ordinance*)**

সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় অথবা সংসদের অধিবেশনকাল ব্যতিত কোন সময়ে যদি জরুরি পরিস্থিতি উদ্ভব হয় যেখানে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয়, তখন রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন এবং জারি হবার সময় হতে অনুরূপ প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের

আইনের ন্যায় ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। উল্লেখ্য অধ্যাদেশ জারি হবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে অধ্যাদেশটি উপস্থাপন এবং উপস্থাপনের ত্রিশ দিনের মধ্যে অধ্যাদেশটি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে অধ্যাদেশটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

- **আদেশ** (***Order***)

দেশে যখন সংবিধান না থাকে তখন দেশ পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি যে নির্দেশের ব্যবস্থা করেন, তাকে আদেশ বলা হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য কোন সংবিধান ছিল না। সেই সময় যা নির্দেশনাবলি দ্বারা দেশ পরিচালিত হয়েছিল সেগুলো আদেশ নামে পরিচিত। উদাহরণ: The Bangladesh Wild Life (Preservation) Order, 1973 (P.O. No. 23 of 1973) যা সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের প্যারা তিন এর ক্ষমতাবলে প্রণীত।

- **বিধিমালা** (***Rules***)

The General Clauses Act, 1897 এর ধারা ৩(৪৭) অনুসারে 'বিধি' অর্থ কোন আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত কোন বিধিকে বুঝায় এবং আইনের অধীন বিধি হিসেবে প্রণীত কোন প্রবিধিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ যা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ধারা ২০ এর ক্ষমতাবলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রণীত। সাধারনত মূল আইন এর বিধানগুলোকে আরও বিস্তারিত দিকনির্দেশনা সহ বিধিমালা রচিত হয়। যেমন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ধারা ১২ পরিবেশগত ছাড়পত্র নেওয়ার নির্দেশ দিলেও কিভাবে পরিবেশগত ছাড়পত্র উত্তোলন করতে হবে তার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর বিধি ৭ এ পাওয়া যায়।

- **প্রবিধি** (***Regulation)***

The General Clauses Act, 1897 এর ধারা ৩(৪৬) অনুসারে প্রবিধি অর্থ বাংলাদেশে বলবৎ এবং সাংবিধানিক দলিলের অধিন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধিকে বোঝায়। সাধারনত রাষ্ট্রপতির আদেশ (Order) এর বিধানগুলোকে আরও বিস্তারিত দিকনির্দেশনা সহ প্রবিধিমালা রচিত হয়। যেমনঃ The Bangladesh Bank Order, 1972 এর ৮২ নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে Bangladesh Bank Procurement Regulations, 2004 প্রণীত হইয়াছে। উল্লেখ্য বিধি ও প্রবিধিমালা দ্বারা প্রণীত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করা জনগনের জন্য বাধ্যতামূলক যদিও আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে এদের secondary law হিসেবে ধরা হয়। যা কোন অবস্থাতেই মূল আইন বা আদেশ এর সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। বিধি বা প্রবিধি আইন বা আদেশের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক প্রণীত।

- **সরকারি গেজেট**

The General Clauses Act, 1897 এর ধারা ৩(৩৭ক) অনুসারে 'সরকারি গেজেট' বা 'গেজেট' অর্থে বাংলাদেশ গেজেটকে বুঝাবে। সাধারণত গেজেট বলতে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পত্র বোঝায় যা মূলত নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, আইন ও অন্যান্য আইনি বিষয়বস্তু প্রকাশ করে।

- **প্রজ্ঞাপন** ***(Notification)***

প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকারি কর্তৃক প্রণীত নির্দেশ বোঝায় যা কোন আইন বা প্রবিধি এর অধীনে প্রণীত হতে পারে। The General Clauses Act, 1897 এর ধারা ২০ অনুসারে সংসদে কোন আইন বা প্রবিধিতে কোন প্রজ্ঞাপন, আদেশ, পরিকল্প (Scheme), বিধি, ফর্ম বা উপ-আইন (bye-law) জারির ক্ষমতা অর্পণ করা হলে সেই ক্ষেত্রে এই আইন প্রবর্তনের পরে প্রণীত অনুরূপ প্রজ্ঞাপন, আদেশ, পরিকল্প, বিধি, ফর্ম বা

উপ-আইনে ব্যবহৃত অভিব্যক্তি সমূহ অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণকারী আইনে ব্যবহৃত অভিব্যক্তির সমার্থক হবে। তাই মূল আইনের ন্যায় প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত নির্দেশও পালন করা আইনত বাধ্যতামূলক। সরকার সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্থায়ী বা সাময়িক নির্দেশ প্রধান করতে পারে যা সাধারণত সরকারি গেজেট মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেমন ২০০২ সালের পবম ৪/২/৯/২০০২/২৪৬ নং প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয় বা পবম ৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫ নং প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে সুন্দরবনসহ বেশ কিছু অঞ্চলকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষণা করা হয় এবং গাছ, বন্য প্রাণী কর্তন, আহরণ, সংগ্রহ সহ বিভিন্ন কার্যাবলি নিষিদ্ধ করা হয়।

- **বিচার বিভাগীয় নজির (Judicial Precedent/Case Law)**

যদিও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থার সমস্ত অংশ বিধিবদ্ধ আইনের আকারে লিপিবদ্ধ আছে, তবুও উৎপত্তির জন্য ইহা ব্রিটিশ কমন ল' এর কাছে ঋণী। ব্রিটিশ কমন ল' নজিরের মতবাদের (Precedent) উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে। আমাদের সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগীয় নজিরের স্বীকৃতি দেয়া হইয়াছে। নজির শব্দটি বিচারকগণ যে পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী মামলার সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে তাকে বোঝায়। সাধারণত উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মামলার সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করা নিম্ন আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক।

- **বিচার বিভাগীয় নজির - পরিবেশগত অধিকার জীবনের অধিকার**

আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় অনুসরণ করা হাইকোর্ট বিভাগ ও অন্যান্য অধঃস্তন আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক। অনুরূপ হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় অনুসরন করা অন্যান্য অধঃস্তন আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক। বিচার বিভাগীয় নজিরের উদাহরণ স্বরূপ পরিবেশের অধিকারকে সর্বোচ্চ আদালত জীবনের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে ১ জুলাই, ১৯৯৬ তারিখে প্রদত্ত ৯২/১৯৯৬ নং রিট মামলার রায়ের মাধ্যমে। মামলার চূড়ান্ত শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এ মর্মে উল্লেখ করে যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ ও ৩২ এ জীবনের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে। আদালত আরোও উল্লেখ করে যে জীবনের অধিকার শুধুমাত্র বেঁচে থাকার অধিকার এ অর্থেই সীমাবদ্ধ নয় বরং একজন মানুষের স্বাস্থ্যকর ও দূষণমুক্ত দীর্ঘ জীবনের অধিকার। এক কথায় জীবনের অধিকার মানে সুস্থ পরিবেশে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। এ মামলার মাধ্যমে মানুষের পরিবেশগত অধিকার জীবনের অধিকার হিসেবে দেশে প্রথম বারের মতো প্রতিষ্ঠিত হয়।

- **বিচার বিভাগীয় নজির - জনস্বার্থে মামলা (Public Interest Litigation)**

২৫ জুলাই, ১৯৯৬ তারিখে অপর একটি রিট মামলায় (মামলা নং ৯৯৮/৯৪) রায়ে আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, উল্লেখ করে যে, অনুচ্ছেদ ১০২ (১) মৌলিক অধিকার বলবৎ করার একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তি একাকী ভোগ করতে পারেন যদি তার ব্যক্তিগত অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকে, কিন্তু তা একজন ব্যক্তি কর্তৃক অন্যদের সাথে অংশীদারিত্বেও ভোগ করতে পারেন যখন অধিকারগুলো সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে এবং ভৌগলিক সীমানার মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং বিস্তৃত হবে। আদালত আরোও বলে যেখানে গণ-অপরাধ অথবা গণ-ক্ষতিগ্রস্ততা অথবা অসংখ্য জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে জনগণের যে কোন একজন সদস্য, যিনি একজন নাগরিক, যিনি সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ততা অথবা অন্যান্যদের সাথে সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার হইয়াছেন অথবা যে কোন নাগরিক অথবা দেশীয় কোন সমিতি যা কোন বিদেশি সংস্থার স্থানীয় অঙ্গ সংগঠন হতে পৃথক সমর্থন দান করার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট কারণে একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হন এবং অনুচ্ছেদ ১০২ এর অধীনে এখতিয়ার ভোগ করার অধিকারী হবেন। এ মামলার মাধ্যমেই বাংলাদেশে জনস্বার্থে মামলা করার অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়।

- **নীতি *(Policy)***

সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম ও কর্মসূচি সঠিক ভাবে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে তাদের করনীয় সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে দিকনির্দেশনা সম্বলিত যে রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় তাকে নীতিমালা বলে। যেমন: পরিবেশ নীতি, ১৯৯২। যেহেতু নীতিমালা কেবল দিকনির্দেশনাই প্রণয়ন করে তাই ইহা বাস্তবায়ন বা অনুসরণ করা কাম্য হলেও আইনের মত বাধ্যতামূলক নয়। আইন সংসদ দ্বারা প্রণীত হলেও নীতিমালা নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক প্রণীত দিকনির্দেশনা।

১.২ আদালত ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বাংলাদেশ এর বর্তমান আদালত ব্যবস্থার অবকাঠামোর ভিত্তি হল দুটি মৌলিক আইন: The Civil Courts Act, 1887 এবং The Code of Criminal Procedure, 1898। এই আইন দুইটি ছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধান সুপ্রিমকোর্টের গঠন প্রকৃতির জন্য মৌলিক আইন। এ ছাড়া কিছু কিছু বিশেষ আইন রয়েছে যা কতিপয় বিশেষ বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল এর গঠন প্রকৃতির ভিত্তি। যেমন: পরিবেশ আদালত, পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ অধীনে গঠিত বিশেষ আইন।

বাংলাদেশের আদালত ব্যবস্থার প্রকৃতি ও কার্যক্রমকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

১। বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট
২। সাধারণ স্তরবিন্যাসে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত সমূহ
৩। ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ আদালত ব্যবস্থা।

নিম্নে সুপ্রিমকোর্ট এবং সাধারণ স্তরবিন্যাসে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত সমূহের একটি সম্মিলিত ছক দেয়া হল-

এক নজরে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা

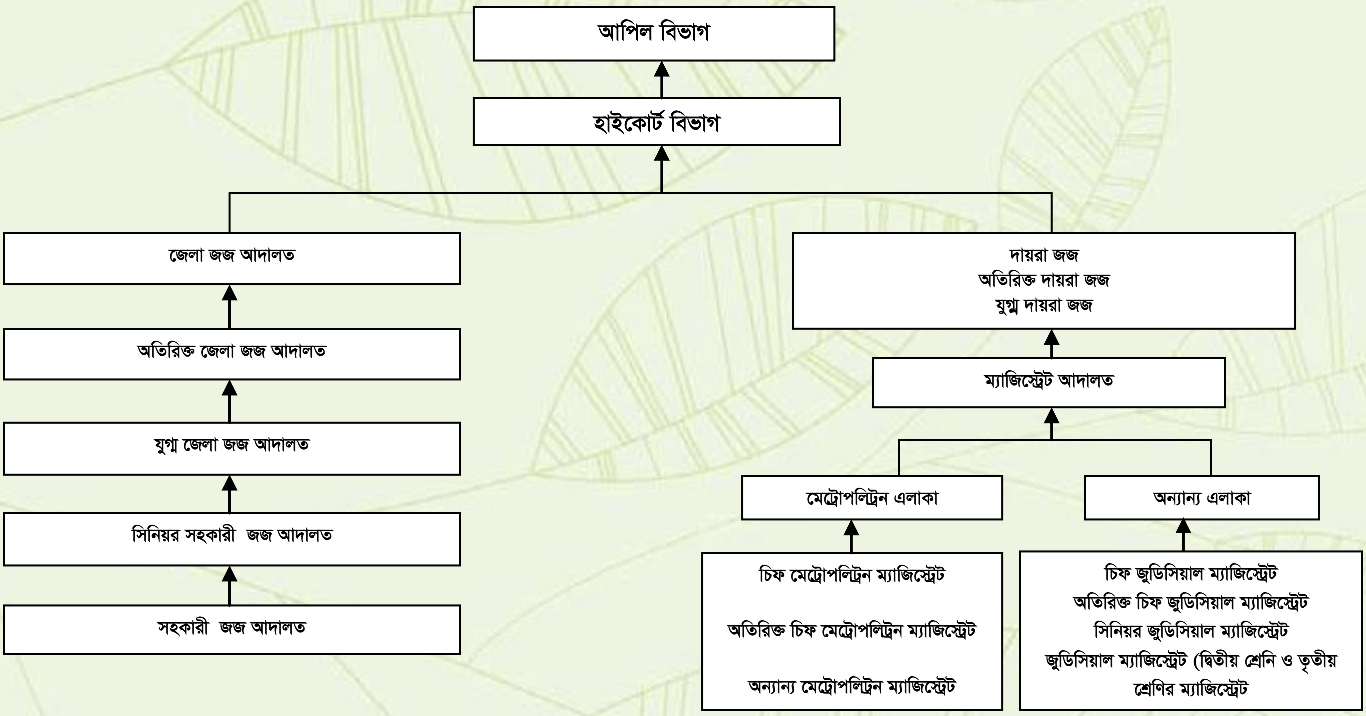

- **বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট**

সংবিধানের ৯৪(২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, বাংলাদেশ সুপ্রমকোর্ট নামে একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে যার দুটি বিভাগ থাকবেঃ ১। হাইকোর্ট বিভাগ ২। আপিল বিভাগ

১। হাইকোর্ট বিভাগ

সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদ অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগ এর ক্ষমতা ও এখতিয়ার এর উৎস দুটি। সংবিধান ও সাধারণ আইন। সাধারণ আইন অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগের আপিল, রিভিশনাল এবং রেফারেন্স এখতিয়ার আছে। সংবিধান অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগের রিট জারির এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ মূলক এখতিয়ার, মামলা হস্তান্তরের ক্ষমতা আছে।

২। আপিল বিভাগ

আপিল বিভাগকে সংবিধান ৪ ধরনের এখতিয়ার দিয়েছেঃ আপিল এখতিয়ার, পরোয়ানা জারি ও নির্বাহের এখতিয়ার, পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার ও উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার।

- **অধঃস্তন দেওয়ানি আদালতের স্তরবিন্যাস**

The Civil Courts Act, 1887 (Amendment, 2001) এর ধারা ৩ অনুসারে দেওয়ানি আদালতসমূহ নিম্নলিখিত পাঁচ ধরনের। উল্লেখ্য এখানে প্রত্যেকটি আদালতই আলাদা আদালত এবং প্রত্যেকের আলাদা অধিক্ষেত্র আছে।

১। সহকারী জজের আদালত;
২। সিনিয়র সহকারী জজের আদালত;
৩। যুগ্ম জেলা জজের আদালত;
৪। অতিরিক্ত জেলা জজের আদালত; এবং
৫। জেলা জজের আদালত।

- **সহকারী জজের আদালত**

দেওয়ানি মামলার সাধারণ স্তরবিন্যাসে সর্বনিম্ন আদালত হল সহকারী জজের আদালত। যেসব মামলার দাবির পরিমাণ ২ লক্ষ টাকার বেশি নয় সেসব মামলা এই আদালতে দায়ের করতে হবে। The Civil Courts Act এর ২৫ ধারার অধীনে এই আদালতই সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র বিষয়ের আদালত (Small Causes Court) হিসেবে ৬০০০ টাকা মূল্যমানের মামলার দায়িত্ব পালন করে বিচার করে থাকে। আবার, গ্রাম আদালতের (Village Court) রায়ের বিরুদ্ধে এই আদালত আপিল ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিরোধ হলে তার বিচার, পারিবারিক আদালতের বিচারক হিসেবে ও দায়িত্ব পালন করে থাকে।

- **সিনিয়র সহকারী জজের আদালত**

যেসব দেওয়ানি মামলার দাবিকৃত টাকার পরিমান ৪ লক্ষ টাকার বেশি নয় সেসব মামলা সিনিয়র সহকারী জজের আদালতে দায়ের করতে হবে। এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজের কাছে আপিল করতে হবে। The Civil Courts Act, 1887 এর ২৫ ধারার অধীনে এই আদালত ক্ষুদ্র বিষয়ের আদালত (Small Causes Court) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। আবার, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন অনুযায়ী এই আদালত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এর দায়িত্ব পালন করে।

- **যুগ্ম জেলা জজের আদালত**

যুগ্ম জেলা জজ দুই ধরনের অধিক্ষেত্র ভোগ করেন। আদি (original) এবং আপিল। আদি অধিক্ষেত্রে যুগ্ম জেলা জজের কোন আর্থিক সীমা নাই। অর্থাৎ কোন দেওয়ানি মামলার দাবিকৃত টাকার পরিমান চার লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে হলে উক্ত মামলা যুগ্ম জেলা জজের আদালতে দায়ের করতে হবে। যুগ্ম জেলা জজের আদালত যেসব মামলার দাবিকৃত টাকার পরিমান পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি নয় সেসব মামলার রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের কাছে মামলা করা যাবে। অন্যদিকে, যেসব মামলার দাবিকৃত টাকার পরিমান পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি সেসব ক্ষেত্রে আপিল দায়ের করতে হবে হাইকোর্ট বিভাগে। Civil Courts Act, 1887 এর ২৫ ধারার অধীনে এই আদালত ক্ষুদ্র বিষয়ের আদালত (Small Causes Court) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে।

- **অতিরিক্ত জেলা জজের আদালত**

অতিরিক্ত জেলা জজের ক্ষমতা জেলা জজের ক্ষমতার সমান। অতিরিক্ত জেলা জজ ঐ সকল মামলার বিচার করেন যেগুলো জেলা জজ তার আদালতে হস্তান্তর করেন। অতিরিক্ত জেলা জজের রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে সাধারনত হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করতে হয়। আমরা পরবর্তীতে দেখব, অতিরিক্ত জেলা জজ ফৌজদারি বিষয়ে অতিরিক্ত দায়রা জজের দায়িত্ব পালন করেন।

- **জেলা জজের আদালত**

সাধারনত জেলা জজ আদি (original) মামলার বিচার করেন না। এর কারণ হল দেওয়ানি কার্যবিধির ১৫ ধারার অধীনে প্রত্যেক মোকদ্দমা অবশ্যই দাখিল করতে হয় সর্বনিম্ন স্তরের বিচার করার উপযুক্ত আদালত। দেউলিয়া, প্রবেট, প্রশাসন, ট্রেডমার্ক আইন ইত্যাদির মত বিভিন্ন বিশেষ আইনে জেলা জজ হলেন কিছু কিছু মামলা বিচারের একমাত্র আদালত। জেলা জজের আর্থিক এখতিয়ার সীমাহীন। এই আদালতের আপিল ও Revisional শুনানির এখতিয়ার আছে। আপিল ও Revision এর ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুরর মূল্যমান পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে জেলা জজের শুনানির এখতিয়ার আছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর মূল্যমান পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি হলে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল বা Revision আবেদন করতে হবে।

- **অধঃস্তন ফৌজদারি আদালতের স্তরবিন্যাস**

অধঃস্তন ফৌজদারি আদালতে দুই ধরনের আদালত দেখতে পাওয়া যায়- দায়রা জজের আদালত এবং ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। দায়রা আদালত তিন ধরনের বিচারক কর্তৃক পরিচালিত হয়:

১। দায়রা জজ;
২। অতিরিক্ত দায়রা জজ; এবং
৩। যুগ্ম দায়রা জজ।

অপরদিকে পাঁচ ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পরিচালিত হয়:

১। চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;
২। অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;
৩। সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট;
৪। দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট; এবং
৫। তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট।

- **দায়রা আদালত:**

ফৌজদারি বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারা দেশকে কতিপয় Session Division- এ ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রতিটি Session Division এ ফৌজদারি কার্যবিধির ৯ ধারা অনুসারে একটি করে দায়রা আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে যা দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ কিংবা যুগ্ম দায়রা জজ দ্বারা পরিচালিত হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় দায়রা জজের আদালত Metropolitan Court of Sessions নামে পরিচিত।

- **দায়রা জজ আদালত:**

ফৌজদারি আদালতের আদি এখতিয়ার বলতে সাধারণত দুটি বিষয় বোঝায়। প্রথমতঃ অপরাধ আমলে নেয়ার এখতিয়ার এবং দ্বিতীয়তঃ অপরাধটি বিচার করার এখতিয়ার। দায়রা জজ আদালতের আদি এখতিয়ার বলতে সাধারণত অপরাধটি বিচার করার এখতিয়ার বোঝায়। দায়রা জজ আদালত আইন দ্বারা আরোপিত যেকোন দণ্ড দিতে পারে তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিলে তা হাইকোর্ট বিভাগের অনুমতি ছাড়া কার্যকর করা যাবে না। যুগ্ম দায়রা জজ বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে দায়রা জজ আপিল শুনে থাকেন।

- **অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত:**

অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত আইন দ্বারা আরোপিত যে কোন দণ্ড দিতে পারে তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিলে তা হাইকোর্ট বিভাগের অনুমতি ছাড়া কার্যকর করা যাবে না। অতিরিক্ত দায়রা জজ দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত মোকদ্দমার বিচার ও আপিল শুনানি করে থাকেন।

- **যুগ্ম দায়রা জজ আদালত:**

যুগ্ম দায়রা জজ আইন দ্বারা আরোপিত যে কোন দণ্ড দিতে পারে তবে মৃত্যুদণ্ড অথবা দশ বছরের বেশি কারাদণ্ড দিতে পারবে না।

- **ম্যাজিস্ট্রেট আদালত**

চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট:

মেট্রোপলিটন এলাকায় চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য এলাকায় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নামে পরিচিত।

অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত:

অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা মেট্রোপলিটন এলাকায় অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলাদা কোন আদালত নয়। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যে দায়িত্ব পালন করবে বা দণ্ড দিতে পারবে একই দণ্ড অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা মেট্রোপলিটন এলাকায় অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট করতে বা দিতে পারবে।

প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট:

প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ বছরের অনধিক দণ্ড দিতে পারবেন না এবং অনধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট:
দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট তিন বছরের অনধিক দণ্ড দিতে পারবেন না এবং অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবেন।

তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট:
তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট দুই বছরের অনধিক দণ্ড দিতে পারবেন এবং অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
আমাদের ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এ উপরোল্লিখিত দুই ধরনের ফৌজদারি আদালত ছাড়াও ধারা ১০ এ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কথা বলা আছে। যার মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ রয়েছেন। যারা সাধারণত মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর অধীনে মোবাইল কোর্ট বা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন এবং কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই আমলে গ্রহণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে, দোষী সাব্যস্ত করে, অনধিক দুই বছর কারাদণ্ড বা সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লিখিত পরিমান অর্থদণ্ড আরোপ করতে পারেন। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রায় সব আইনের অধীনেই মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিধান রয়েছে।

দ্বিতীয় অধিবেশন	পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা: আইন, বিধি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচার ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

১. পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে ধারণা লাভের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত আইন, বিধি, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে;

২. এ অধিবেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশব্যবস্থা ও দূষণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান, সুনির্দিষ্ট কেইস আলোচনা এবং এ সংক্রান্ত কি ধরণের আইন, বিধি, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং বিচারিক ব্যবস্থা আছে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের বিস্তারিত জানানোই এ অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য।

উপকরণ ঃ হ্যান্ডআউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার পেন, পোস্টার, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ দলীয় আলোচনা, প্রদর্শনী , কেইস স্টাডি, প্রশ্নোত্তর।

সময় ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ

প্রশিক্ষক এই অধিবেশনে-

- প্রথমে পরিবেশ, প্রতিবেশ ব্যবস্থার ও দূষণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে এই এলাকার পরিবেশ, প্রতিবেশ ব্যবস্থার ও দূষণ এর সাথে সম্পর্কিত আঞ্চলিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করবেন;

- এরপর চিহ্নিত আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতি সমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরবেন এবং আলোচনা করবেন;

- আইন, বিধি ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানসমূহ, তাদের কাঠামো ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দিবেন;

- এবং আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধিসমূহ ভঙ্গ হলে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা, ক্ষতিগ্রস্থের জন্য প্রতিকার ও দোষী ব্যক্তির জন্য শাস্তিবিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা।

২.১ *বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও দূষণ*

প্রাকৃতিক সম্পদে প্রাচুর্য্যময় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমান্বয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বেও আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বন বেশ সমৃদ্ধ ছিল। অথচ আজ বনের দিকে দৃষ্টি দিলে হতাশ হতে হয়। বর্তমানে প্রতিবছর বন ধ্বংসের হার ৩% যা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। বন ধ্বংসের পরিমাণ এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বনের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্য । আবার নদী-নালা, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড় ইত্যাদির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। দেশে প্রবাহিত ৩৩০টি নদীর অধিকাংশই দখল/ভরাট করায় সংকুচিত হইয়াছে। একইসাথে বিভিন্ন বর্জ্য এবং অপরিশোধিত রাসায়নিক বর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছে নদীর পানি। যার ফলে ধ্বংস হচ্ছে জলজ সম্পদ। এগুলোর সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে।

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের অন্যতম কারণ জৈবিক ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় না নিয়ে, স্বল্পসময়ে অধিক মুনাফা অর্জন এবং বিদ্যমান আইন পালনে অনীহা। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রক্ষার জন্য প্রয়োজন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন, প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন। এছাড়াও সম্পদ রক্ষা, ব্যবস্থাপনা বা বৃদ্ধির জন্য গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য। বিষয়টি বিষদভাবে বলতে গেলে দাঁড়ায় বন ব্যবস্থাপনায় বনবাসীদের সম্পৃক্তকরণ, জলজ সম্পদে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রবেশ নিশ্চিতকরণ ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ, আইন প্রণয়নে ও পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের মতামত গ্রহণ এবং সর্বোপরি সকল বিষয়ে ভুক্তভোগীদের মতামত গ্রহণ। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দেওয়ার পূর্বে প্রথমেই জানানো প্রয়োজন যে পরিবেশ প্রতিবেশ ব্যবস্থা এবং দূষণ বলতে কি বুঝায়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ অইন, ১৯৯৫ পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই এ আইনে কিছু সংজ্ঞা প্রদান করা হয় যা নিম্নরূপ-

- *পরিবেশ: বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ {ধারা ২(ঘ)}*
  "পরিবেশ" অর্থ পানি, বায়ু, মাটি ও ভৌত সম্পদ ও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কসহ ইহাদের সহিত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অণুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক:

- *প্রতিবেশ ব্যবস্থা: বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ {ধারা ২(ছ)}*
  "প্রতিবেশ ব্যবস্থা" অর্থ পরিবেশের উপাদানসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্যযুক্ত জটিল সম্মিলন, যাহা উদ্ভিদও প্রাণিকুলের সংরক্ষণ ও বিকাশকে সহায়তা ও প্রভাবিত করে:

- *দূষণ: বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ {ধারা ২(খ)}*
  "দূষণ" অর্থ বায়ু পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা উহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসহ বায়ু, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা উহাদের ভৌতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক গুণাবলির পরিবর্তন, অথবা বায়ু, পানি, মাটি বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোন পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু, পানি, মাটি, গবাদি পশু, বন্যপ্রাণী, পাখি, মৎস্য, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্য ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকর বা ধংসাত্নক কার্য;

২.২. পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা রক্ষায় আইন, নীতি ও কেইস স্টাডি:

তথাকথিত উন্নয়নের নামে মনুষ্যসৃষ্ট নানা কর্মকাণ্ডের দরুন আমাদের পরিবেশ আজ হুমকির মুখে। প্রতিটি প্রাকৃতিক সম্পদ আজ ধ্বংসের মুখে। নদী, বন নির্বিচারে দখল ও দূষিত হচ্ছে। একইভাবে দূষিত হচ্ছে বাতাস। অনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের কালো ধোঁয়া বিষিয়ে তুলছে বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন বাতাসকে। অতিমাত্রায় ব্যবহৃত নিষিদ্ধ হাইড্রোলিক হর্ন, যত্রতত্র মাইকের ব্যবহার, দোকানে দোকানে অতিরিক্ত শব্দে মিউজিকের ব্যবহার বাড়িয়ে তুলছে শব্দ দূষণ। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এসব দূষণরোধে রয়েছে আইন ও আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা। তারপরও চলছে দূষণ। লঙ্ঘন হচ্ছে দেশে প্রচলিত আইনি বিধানসমূহ। আইন লঙ্ঘনের কিছু প্রেক্ষাপট ও আদালতের নির্দেশনা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

কেইস স্টাডি-১

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলায় সংরক্ষিত বনের পাশে অনুমোদন ব্যতিরেকে ও অবৈধভাবে ২২টি ইটভাটা ও ২০টি করাতকল গড়ে দীর্ঘদিন ধরে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। সংরক্ষিত বনের গাছ কেটে পোড়ানো হচ্ছিল এসব ইটভাটায়। আর সেগুলো চেরা হচ্ছিল করাতকলে। এ ২২টি ইটভাটার অবস্থান সংরক্ষিত বনের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে লোহাগাড়া উপজেলার চরম্বা ইউনিয়নে বনের আধা কিলোমিটারের মধ্যে ৮টি, পুটিবিলা ইউনিয়নে বনের ২ কিলোমিটারের মধ্যে ৪টি এবং উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বনের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে ১০টি ইটভাটা কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। বন বিভাগ সূত্র অনুযায়ী উপজেলার ৪৮টি করাত কলের মধ্যে সংরক্ষিত বনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে চুনতিতে ৩টি, বড়হাতিয়ায় ৫টি, আধুনগরে ২টি, পুটিবিলায় ৪টি, চরম্বায় ৪টি, কলাউজানে ২টি মোট ২০টি করাতকল অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। এ অবস্থায় স'মিল ও ইটভাটাগুলো অন্যত্র গ্রহণযোগ্য কোন স্থানে স্থানান্তরের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট মামলা (রিট মামলা নং ১০৭৬৬/২০১১) দায়ের করা হয়। মামলার চূড়ান্ত শুনানি শেষে হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে রায় প্রদান করে। উক্ত রায়ে আদালত একমাসের মধ্যে ইটভাটা ও স'মিলগুলো গ্রহণযোগ্য কোনো স্থানে স্থানান্তরের নির্দেশ প্রদান করে।

তথ্যসূত্র: কেইসটি বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) দায়েরকৃত রিট মামলা থেকে সংগৃহীত।

২.২.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২

- **অনুচ্ছেদ ৩১:**

এ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইন অনুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইন অনুযায়ী ব্যতিরেকে অন্য এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

- **অনুচ্ছেদ ৩২:**

এ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে আইন ব্যতিরেকে অন্যের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

- **অনুচ্ছেদ ১৮ক:**

এ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবে (২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংযোজিত)।

২.২.২ পরিবেশ নীতি, ১৯৯২

- **পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্য (নীতি ২)**
  - পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন;
  - দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষা;
  - সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয় মূলক কর্মকাণ্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ;
  - সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
  - সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহারের নিশ্চিয়তা বিধান; এবং
  - পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সহিত যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।

- **পরিবেশ ও আইনগত কাঠামো (নীতি ৪)**
  - পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সহিত সম্পর্কিত সকল বর্তমান আইন সময়োপযোগী করিয়া সংশোধন;
  - পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়ন;
  - প্রাসঙ্গিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এতদসম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিকরণ; এবং
  - পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।

- **পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (নীতি ৫)**
  - পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করিবে;
  - এই নীতি বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠন করিবে;
  - ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশগত অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই নীতি যথাযথভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে; এবং
  - পরিবেশ অধিদপ্তর সকল ইআইএ এর চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করিবে।

২.২.৩ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)

পরিবেশ নীতিমালায় ঘোষিত নীতিসমূহকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও এ আইনের অধীনে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ প্রণয়ন করা হয়। এ আইন ও বিধিমালা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে মূল আইন হিসেবে পরিচিত। নিম্নে এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো আলোচনা করা হলো-

- *প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা*

ধারা ৫

সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area)

ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অবিলম্বে উক্ত সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে উত্তোরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

ধারা ৫ (২)

উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সকল প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট এলাকার সীমানা ও মানচিত্রসহ আইনগত বর্ণনার উল্লেখ থাকিবে এবং এই সকল মানচিত্র ও আইনগত বর্ণনা সংশ্লিষ্ট এলাকাতে প্রদর্শিত হইবে এবং তাহা উক্ত এলাকার দালিলিক বর্ণনা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ধারা ৫ (৩)

কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার পর সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।

ধারা ৫ (৪)

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন বলিয়া ঘোষিত এলাকায় কোন কোন ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

ধারা ১৫(শাস্তি)

ধারা ৫ এর বিধান লঙ্ঘনের প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

- ***পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন সম্পর্কে বাধা-নিষেধ***

ধারা ৬ (১)

স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন চালানো যাইবে না বা উক্তরূপ ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনভাবে উক্ত যানবাহন চালু করা যাইবে না।

ধারা ৬ (২)

উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন যানবাহন যে কোন স্থানে পরীক্ষা করিতে বা চলমান থাকিলে উহাকে থামাইয়া তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করিতে, এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ব্যাপী আটকাইয়া রাখিতে (Detain), বা উক্ত উপ-ধারা লঙ্ঘনকারী যানবাহন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আটক করিতে (seize) বা উহার পরীক্ষাকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

ধারা ৬ (৩)

উপ-ধারা (২) এর অধীনে তাৎক্ষণিকভাবে কোন যানবাহন পরীক্ষা করা হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

ধারা ৬ (৪)ঃ

উপ-ধারা (১) এর বিধান বা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট যানবাহনের চালক বা ক্ষেত্রমত মালিক বা উভয় ব্যক্তি দায়ী থাকিবেন।

ধারা ১৫ (শাস্তি):
ধারা ৬ এর বিধান লঙ্ঘনের প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড; দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রদান করা হইবে।

- ***পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ:***

ধারা ৬ক
সরকার, মহাপরিচালকের পরামর্শ বা অন্য কোনভাবে যদি সন্তুষ্ট হয় যে, সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ, বা পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরি অন্য কোন সামগ্রী বা অন্য যে কোন সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীনে ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ২ জারি করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বাধ্য থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা: উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানি করা হইলে বা রপ্তানির কাজে ব্যবহৃত হইলে; (খ) কোন নির্দিষ্ট পলিথিন শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হইলে।

ধারা ১৫ (শাস্তি)
ধারা ৬ ক এর বিধান লঙ্ঘনের প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রদান করা হইবে।

- ***পাহাড় কাটা সম্পর্কে বাধা-নিষেধ:***

ধারা ৬খ
কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (cutting and/or razing) করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইতে পারে।

- ***ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, আমদানি, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, পরিবহণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ***

ধারা ৬গ:
পরিবেশের ক্ষতিরোধকল্পে সরকার, অন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, সরবরাহ, পরিবহণ, আমদানি, রপ্তানি, পরিত্যাগকরণ (Disposal), ডাম্পিং, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ধারা ১৫(শাস্তি):
ধারা ৬গ এর বিধান লঙ্ঘনের প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রদান করা হইবে।

- *জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কারণে সৃষ্ট দূষণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ*

ধারা ৬ঘঃ
কোন জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার ফলে কোন প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি না হয় তাহা প্রত্যেক জাহাজের মালিক, আমদানিকারক এবং জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কাজে ইয়ার্ড ব্যবহারকারী নিশ্চিত করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা ১৫(শাস্তি):
ধারা ৬ঘ এর বিধান লঙ্ঘনের প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রদান করা হইবে।

- *জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ*

ধারা ৬(ঙ):
আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে।

ধারা ১৫(শাস্তি):
ধারা ৬(ঙ) এর বিধান লঙ্ঘনের প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রদান করা হইবে ।

- *প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ*

ধারা ৭ (১):
মহাপরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমান নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহন বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা ৭(২):
উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নির্দেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিলে মহাপরিচালক যথাযথ এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা বা উক্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারি মামলা বা উভয় প্রকার মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

ধারা ৭ (৩):
উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে মহাপরিচালক দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা ৭(৪):
সরকার এই ধারার অধীনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহাপরিচালককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

ধারা ১৫(শাস্তি):
ধারা ৭ এর বিধান লঙ্ঘনের প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রদান করা হইবে।

- ***ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কাগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন***

ধারা ৮(১):
পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কাগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকার চেয়ে মহাপরিচালক বরাবর আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করিবে এবং ধারা ৮(২)-এ বলা হইয়াছে এইরূপ আবেদন নিস্পত্তি করিতে মহাপরিচালক গণ-শুনানিসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

- ***অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গমনে বাধ্যবাধকতা ও শাস্তি:***

ধারা ৯(১)
যে ক্ষেত্রে কোন কাজ বা ঘটনা বা কর্মকাণ্ড বা কোন দুর্ঘটনার ফলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত হয় বা নির্গত হইবার আশঙ্কা থাকে, সেই ক্ষেত্রে তদ্রূপ নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নির্গমন স্থানটির দখলকার ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা ৯(৩)
এই ধারার অধীন কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত হইলে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যথাশীঘ্র সম্ভব, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিবেন এবং নির্দেশিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা ১৫(শাস্তি):
ধারা ৯ এর বিধান লঙ্ঘনের প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রদান করা হইবে ।

- *পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিধান (ধারা ১২)*

ধারা ১২(১):
মহাপরিচালকের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।

ধারা ১২(২):
এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ কার্যকরের পর অবিলম্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

ধারা ১২ (৩):
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

ধারা ১৫(শাস্তি):
ধারা ১২ এর বিধান লঙ্ঘনে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা, অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রযোজ্য ।

২.২.৪ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ২০ ধারার ক্ষমতাবলে সরকার ১৯৯৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণয়ন করে। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে নিম্নে এ বিধিমালার গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো তুলে ধরা হলো-

- *প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা (বিধি ৩)*

বিধি ৩(১):
ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) বিধান অনুসারে কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করার নিমিত্তে সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিবে, যথা:- মানববসতি, প্রচীন স্মৃতিসৌধ, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, গেম রিজার্ভ, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ, বনাঞ্চল, এলাকাভিত্তিক জীববৈচিত্র্য এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

বিধি ৩(২):
প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার বিধি ১২ ও ১৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট করিবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সরকার এ বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে সময়ে সময়ে গেজেট প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে বিভিন্ন গুরূত্বপূর্ণ স্থানকে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করেছে এবং সেখানে কিছু কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

২.২.৫ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত গেজেট প্রজ্ঞাপণসমূহ:

১৯ এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে সরকার সুন্দরবনের ৭৬২০৩৪ হেক্টর, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকতের ১০,৪৬৫ হেক্টর, সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ৫৯০ হেক্টর, সোনাদিয়া দ্বীপের ৪, ৯১৬ হেক্টর, হাকালুকি হাওরের ১৮৩৮৩ হেক্টর এবং টাংগুয়ার হাওরের ৯৭২৭ হেক্টর এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করেছে এবং নিম্নরূপ কাজ নিষিদ্ধ করেছে-

- প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ;
- সকল প্রকার শিকার ও বণ্যপ্রাণী হত্যা;
- ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ;
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যক্রম;
- ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট নষ্ট/পরিবর্তন করিতে পারে এমন সকল কাজ;
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং
- মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলি।

২.২.৬ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি (বিধি ৭)

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার বিধি ৭(১)-এ বলা হইয়াছে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ নিম্নবর্ণিত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত হইবে, যথা: সবুজ; কমলা-ক; কমলা-খ; এবং লাল।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার বিধি ৭(৪)-এ বলা হইয়াছে কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল শ্রেণিভুক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অবস্থানগত এবং তৎপর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের আবেদনক্রমে এবং মহাপরিচালক যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান ব্যতিরেকে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে পারিবেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার বিধি ৭(৫)-এ বলা হইয়াছে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা তফসিল ১৩ তে বর্ণিত যথাযথ ফি সহ ফরম-৩ এ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন এবং বিধি ৭(৬) অনুযায়ী উপ-বিধি (৫) এ উল্লেখিত আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা-

সবুজ শ্রেণির ক্ষেত্রে:

- শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলি;
- কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত বিবরণ; এবং
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র।

কমলা- ক শ্রেণির ক্ষেত্রে:

- শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলি;
- কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত বিবরণ;
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;
- প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম;
- লে আউট প্লান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত); এবং

- বর্জ্য নির্গমন ব্যবস্থা;
- পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

কমলা - খ শ্রেণির ক্ষেত্রেঃ

- শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
- প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (Initial Environmental Examination IEE = আইই) প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লেআউট প্লান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগার (Effluent treatment Plant ETP = ইটিপি) এর নকশা সংযুক্ত থাকিবে (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental Management Plan EMP = ইএমপি) প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে-আউট প্লান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত); বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ উহার কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত থাকিবে (কেবল বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র; এবং
- পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত জরুরি পরিকল্পনাসহ দূষণের প্রকোপ হ্রাসকরণ পরিকল্পনা;
- পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরোখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

লাল শ্রেণির ক্ষেত্রে

- শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
- প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, যাহার সহিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের (Environmental Impact Assesscent EIA = ইআইএ) কার্যপরিধি, সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম সংযুক্ত থাকিবে, অথবা, অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোপূর্বে অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের লে আউট প্লান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ সময়সূচি প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম সংযুক্ত থাকিবে (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ উহার কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত থাকিবে (কেবল বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ; এবং
- পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত জরুরি পরিকল্পনাসহ দূষণের প্রকোপ হ্রাসকরণ পরিকল্পনা;
- পুনঃস্থাপন পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

বিধি ৭(৭)-এ বলা হইয়াছে উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সবুজ শ্রেণিভুক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে পনের কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা হইবে।

বিধি ৭(৮)-এ বলা হইয়াছে উপ-বিধি (৬) এর উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণিভুক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিশ কার্যদিবস এবং কমলা খ ও লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উদ্যোক্তা ষাট কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা, যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা হইবে।

বিধি ৭(৯)-এ বলা হইয়াছে উপ-বিধি (৮) এ উল্লেখিত অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উদ্যোক্তা ভূমি উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইটিপিসহ যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে পারিবে (কেবল কমলা-ক এবং কমলা-খ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য); এ কার্যাবলি সম্পন্ন হওয়ার পর তাহা অবহিত করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিবে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যাতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু করিতে পারিবে না (কেবল কমলা-ক এবং কমলা-খ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য); প্রাথমিক সমীক্ষা (আইইই) প্রতিবেদনে উল্লেখিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া ইটিপি'র নকশাসহ সময়সূচি নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করিবে (কেবল লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

বিধি ৭(১০) এ বলা হইয়াছে উপ-বিধি (৯) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে পনের কার্য দিবস এবং কমলা-খ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে। আবেদন প্রাপ্তির পর লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ষাট কার্যদিবসের মধ্যে ইটিপি'র নক্সাসহ সময়সূচি এবং ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদন করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

বিধি ৭(১২)-এ বলা হইয়াছে উপ-বিধি (১১) এর অধীন ইআইএ অনুমোদিত হওয়ার পর উদ্যোক্তা আমদানিতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলিতে পারিবে, যাহাতে ইটিপি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে; এবং ইটিপি স্থাপন করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিবে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু করিতে পারিবে না।

বিধি ৭(১৩)-এ বলা হইয়াছে উপ-বিধি (১২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

বিধি ৭(১৪)-এ বলা হইয়াছে উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণিভুক্ত বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিশ কার্যদিবস

এবং কমলা-খ এবং লাল শ্রেণিভুক্ত বিদ্যমান শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ষাট কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে অথবা পৃষ্ঠার অপর দিকে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা হইবে।

পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের (Environmental Impact Assesscent EIA - ইআইএ) ধাপসমূহ নিম্নের Flow Chart এ বর্ণনা করা হল:

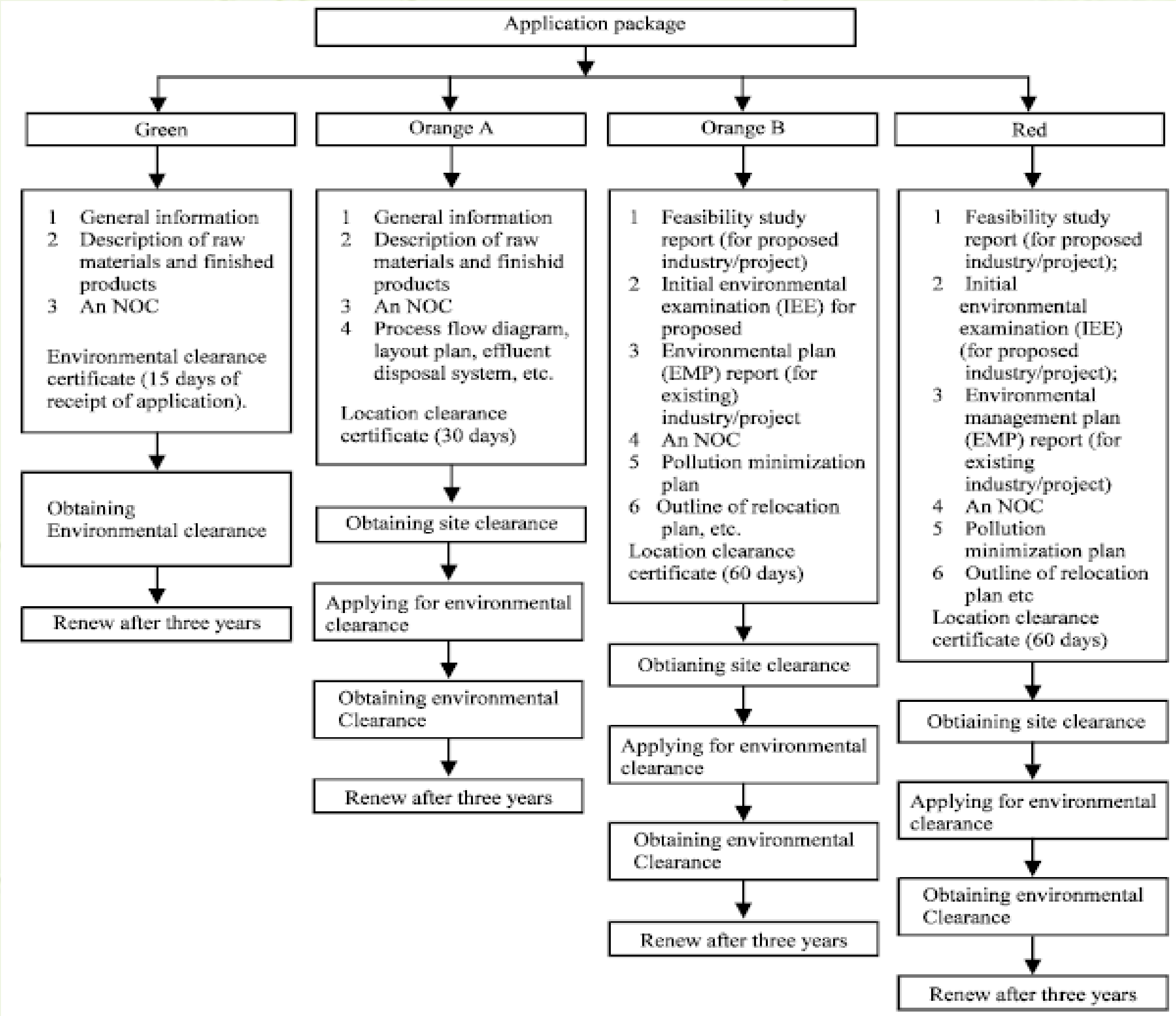

তথ্যসূত্র: *Department of Environment, 1997, EIA Guidelines for Industries.*

২.২.৭ ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

পরিবেশ সংরক্ষণে উপরোক্ত আইন ও বিধিমালা ছাড়াও বিশেষ কিছু আইন পরিবেশ দূষণরোধে অতি প্রয়োজনীয় ও জরুরি। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে তাই সরকার ২০১৩ সালে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। এ আইনের নিম্নরূপ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান তুলে ধরা হলো-

- **ইটভাটার লাইসেন্স গ্রহণের বিধিনিষেধ ও শাস্তি**

ধারা ৪:
ইটভাটা যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট প্রস্তুত করিতে পারিবে না। তবে শর্ত থাকে যে, কংক্রিট কম্প্রেসড ব্লক ইট প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রে এইরূপ লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না। "কংক্রিট কম্প্রেসড ব্লক ইট" অর্থ কংক্রিট, বালি ও সিমেন্ট দ্বারা তৈরি কোন ইট ।

ধারা ১৪ (শাস্তি):
এ আইনের ধারা ১৪-এ বলা হইয়াছে এ ধারার (ধারা ৪) বিধান লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি হবে অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।

- **কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা সুরক্ষা**

ধারা ৫(১):
কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা হইতে মাটি কাটিয়া বা সংগ্রহ করিয়া ইটের কাঁচামাল হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

ধারা ১৫ (শাস্তি):
ধারা ৫(১) এর বিধান লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হইবে।

- **মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাঁওড় বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করা**

সুরক্ষা ধারা *৫(২):*
যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত, কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাঁওড় বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হতে মাটি কাটিতে বা সংগ্রহ করিতে পারিবে না ।

ধারা ১৫(শাস্তি):
উপধারা ৫(১) (২)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার শাস্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হইবে।

- **মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসকরণ**

ধারা ৫(৩):
ইটের কাঁচামাল হিসাবে মাটির ব্যবহার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ ফাঁপা ইট (Hollow Brick) প্রস্তুত করিতে হইবে।

ধারা ১৫(শাস্তি):
৫(৩)-এর বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হইবে।

- **ব্যক্তি ভারী যানবাহন দ্বারা ইট বা ইটের কাঁচামাল পরিবহন**

ধারা ৫(৪):
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত উপজেলা বা ইউনিয়ন বা গ্রামীণ সড়ক ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি ভারী যানবাহন দ্বারা ইট বা ইটের কাঁচামাল পরিবহন করিতে পারিবে না।

ধারা ১৫(শাস্তি):
ধারা ৫ (৪) লঙ্ঘনের শাস্তি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হবে।

- **জ্বালানি হিসাবে কোন জ্বালানি কাঠ ব্যবহার**

ধারা ৬:
এ ধারায় বলা হইয়াছে কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসাবে কোন জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

ধারা ১৬ (শাস্তি):
এ ধারার বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড প্রদান করা হইবে।

- **কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ**

ধারা ৭:
কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, এ্যাশ, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

ধারা ১৭ (শাস্তি):
এ ধারা ৭ এর বিধান লঙ্ঘন করলে তাহার শাস্তি অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হইবে।

- **ইটভাটা স্থাপনের নিষিদ্ধ এলাকা**

ধারা ৮(১)
ছাড়পত্র থাকুক বা না থাকুক এই আইন কার্যকর হইবার পর নিম্নবর্ণিত এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি কোন ইটভাটা স্থাপন করিতে পারিবেন না-
(ক) আবাসিক, সংরক্ষিত বা বাণিজ্যিক এলাকা;
(খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর;
(গ) সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বন, অভয়ারণ্য, বাগান বা জলাভূমি;
(ঘ) কৃষি জমি;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা;
(চ) ডিগ্রেডেড এয়ার শেড (Degraded Air Shed) ।

ধারা ৮(২):
নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে ইটভাটা স্থাপনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন আইনের অধীন কোনরূপ অনুমতি বা ছাড়পত্র বা লাইসেন্স, যে নামেই অভিহিত হউক, প্রদান করিতে পারিবে না ।

ধারা ৮(৩):
পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত দূরত্বে বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করিতে পারিবেন না, যথা: -

(ক) নিষিদ্ধ এলাকার সীমারেখা হইতে ন্যূনতম ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;
(খ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত, সরকারি বনাঞ্চলের সীমারেখা হইতে ২ (দুই) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;
(গ) কোন পাহাড় বা টিলার উপরিভাগে বা ঢালে বা তৎসংলগ্ন সমতলে কোন ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত পাহাড় বা টিলার পাদদেশ হইতে কমপক্ষে অর্ধ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;
(ঘ) পার্বত্য জেলায় ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে, পার্বত্য জেলার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে;
(ঙ) বিশেষ কোন স্থাপনা, রেলপথ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বা অনুরূপ কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠান হইতে কমপক্ষে ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে; এবং
(চ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত উপজেলা বা ইউনিয়ন বা গ্রামীণ সড়ক হইতে কমপক্ষে অর্ধ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে ।

ধারা ৮(৪):
এই ধারা কার্যকর হইবার পূর্বে, ছাড়পত্র গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি যদি নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার মধ্যে বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত দূরত্বের মধ্যে বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি, এই আইন কার্যকর হইবার ২ (দুই) বৎসর সময়সীমার মধ্যে, উক্ত ইটভাটা, এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে, যথাস্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় তাহার লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।

ধারা ৮ অনুযায়ী-

- **"আবাসিক এলাকা"** অর্থ এমন কোন এলাকা যেখানে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) টি পরিবার বসবাস করে;
- **"জলাভূমি"** অর্থ কোন ভূমি যাহা বৎসরের ৬ (ছয়) মাস বা তদূর্ধ্ব সময় পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে এবং যাহা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত;
- **"প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা"** অর্থ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত কোন এলাকা;
- **"বাগান"** অর্থ এমন কোন স্থান যেখানে হেক্টর প্রতি কমপক্ষে ১০০ (একশত) টি ফলজ বা বনজ বা উভয় প্রকারের বৃক্ষ রহিয়াছে, এবং চা বাগানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং
- **"ব্যক্তিমালিকানাধীন বন"** অর্থ এমন কোন বন যাহা বন অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যক্তি মালিকানাধীন বন হিসাবে স্বীকৃত এবং যাহার গাছপালার আচ্ছাদন (crown cover) বনের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) ভাগ এলাকায় বিস্তৃত থাকে, এবং সামাজিক বন বা গ্রামীণ বনও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ধারা ১৮ (শাস্তি):
কোন ব্যক্তি ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড এবং ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাবলি লঙ্ঘন অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড প্রদান করা হইবে।

২.২.৮ করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২

- ***করাত-কল স্থাপন বা পরিচালনার ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাদি***

বিধি ৭(১):
নিম্নবর্ণিত স্থানে করাত-কল স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না, যথাঃ -
- সংরক্ষিত, রক্ষিত, অর্পিত বা অন্য যে কোন ধরনের সরকারি বন ভূমির সীমানা হইতে ন্যূনতম ১০ (দশ) কিলোমিটারের মধ্যে, বা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্থল সীমানা হইতে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) কিলোমিটারের মধ্যে, পৌর এলাকা ব্যতীত;
- কোন সরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিনোদন পার্ক, উদ্যান এবং জনস্বাস্থ্য বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা বিঘ্ন সৃষ্টি করে এইরূপ কোন স্থানে ন্যূনতম ২০০ (দুইশত) মিটার এর মধ্যেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধি কার্যকর হইবার তারিখে এই বিধিতে উল্লেখিত কোন স্থানে কোন করাত-কল স্থাপিত হইয়া থাকিলে বা স্থাপিত করাত-কল পরিচালনাধীন থাকিলে উহা কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে অন্যূন ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে করাত-কল মালিক উক্ত করাত-কল বন্ধ করিয়া দিবেন, অন্যথায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা বন্ধ করিবার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বিধি ৭(২):
সকাল ৬.০০ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা সময়সীমার পূর্বে বা পরে কোন করাত-কল পরিচালনা করা যাইবে না।

বিধি (৩):
কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এবং (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহার ক্ষেত্রে বিধি ১২ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

- **লাইসেন্স বাতিল**

বিধি ৮(১)
দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত কারণে কোন করাত-কলের লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন, যথাঃ -
- বিধি ৭ এবং লাইসেন্সে উল্লেখিত শর্তাবলি লঙ্ঘন করিলে; বা
- কোন করাত-কল মালিক বা উহা পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তি আইন বা বিধিমালার অধীন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে।

বিধি ৮(২)
উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি বিধি ৬ এ নির্ধারিত সময়ে [লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৩ (তিন) মাসের মধ্যে] নবায়নের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে তদ্‌বরাবরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

বিধি ৮(৩)
উপ-বিধি (১) অনুসারে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স বাতিল করা হইলে বা উপ-বিধি (২) অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইসেন্স বাতিল হইলে কোন করাত-কল মালিক বা ব্যক্তি উহার পরিচালনা অব্যাহত রাখিলে, তাহার ক্ষেত্রে বিধি ১২ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

বিধি ১২
কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অন্যূন দুইমাস বা অনধিক তিন বছর কারাদণ্ড এবং উহার অতিরিক্ত নূন্যতম দুই হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

২.৩ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ
উপরোক্ত পরিবেশ আইন, বিধিমালা ও নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং আপিল গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। উপরোক্ত নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী পরিবেশ রক্ষায় ও পরিবেশ আইন বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে-

২.৩.১ পরিবেশ নীতি, ১৯৯২
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করিবে (অনুচ্ছেদ ৫);
- এই নীতি বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠন করিবে (অনুচ্ছেদ ৫);
- ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশগত অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই নীতি যথাযথভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে (অনুচ্ছেদ ৫);
- পরিবেশ অধিদপ্তর সকল ইআইএ এর চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করিবে (অনুচ্ছেদ ৫)।

২.৩.২ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে, পরিবেশ অধিদপ্তর কে নিম্নরূপ ক্ষমতা ও কার্যাবলি প্রদান করা হইয়াছে-

মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ধারা ৪(১):
পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদেশ্যে মহাপরিচালক তৎকর্তৃক সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় লিখিত নির্দেশ দিতে পারিবেন।

ধারা ৪(২):
বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া অনুরূপ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্য অন্তর্ভূক্ত হইবে, যথাঃ-

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলির সহিত সমন্বয় সাধন;
(খ) পরিবেশ অবক্ষয় ও দূষণের কারণ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনুরূপ দুর্ঘটনার প্রতিকারমূলক কার্যক্রম নির্ধারণ ও তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রদান;
(গ) বিপদজনক পদার্থ বা উহার উপাদানের পরিবেশসম্মত ব্যবহার, সংরক্ষণ, পরিবহন, আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমত নির্দেশ প্রদান;
(ঘ) পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও দূষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে অনুরূপ কাজে সহযোগিতা প্রদান;
(ঙ) পরিবেশ উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমনের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থান, প্রাঙ্গণ, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন বা অন্যবিধ প্রক্রিয়া, উপাদান বা পদার্থ পরীক্ষাকরণ এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান;
(চ) পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার;
(ছ) যে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিবেশ দূষণ ঘটাইতে পারে সেই সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিহার করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
(জ) পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ও রিপোর্ট প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে পানীয় জলের মান অনুসরণে পরামর্শ বা, ক্ষেত্রমত নির্দেশ প্রদান।

ধারা ৪(৩):
এই ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশে কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ও থাকিতে পারিবে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে,-

(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার মালিক বা দখলদারকে উহার কার্যক্রম পরিবেশসম্মত করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) মহাপরিচালক যথাযথ মনে করিলে উক্ত নোটিশে ইহাও উল্লেখ করিতে পারিবেন যে, নোটিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশসম্মত না করা হইলে ধারা ৪ক এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে মহাপরিচালক, জরুরি বিবেচনায়, তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

ধারা ৪(৪):
মহাপরিচালক কর্তৃক এ ধারার অধীন জারিকৃত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করার সময় সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

- **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**

ধারা ৪ক (১):
এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

ধারা ৪ক (২)
ধারা ৪ (৩) এর অধীনে মহাপরিচালক কর্তৃক কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান সত্ত্বেও উহার মালিক বা দখলদার উক্ত নির্দেশ পালন না করিলে, মহাপরিচালক উক্ত শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার জন্য সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা পানির সংযোগ বা এইরূপ সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা অন্য কোন সেবা বন্ধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংযোগদাতা বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা ৪ক (৩)
উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইলে, উক্ত সংযোগ বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিতে বা অন্য কোন দলিলে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত নির্দেশ অনুসারে উহাতে উল্লেখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

- **পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিতকরণ**

ধারা ৮(১)
পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কাগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকার চেয়ে মহাপরিচালক বরাবর আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করিবে

ধারা ৮(২)
এইরূপ আবেদন নিস্পত্তি করিতে মহাপরিচালক গণ-শুনানিসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

- **অতিরিক্ত পরিবেশ দুষক নির্গমন ইত্যাদি**

ধারা ৯(৩)
কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত হইলে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যথাশীঘ্র সম্ভব, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিবেন এবং নির্দেশিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

- **পরিবেশগত ছাড়পত্র**

ধারা ১২(৫)
অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের তালিকা প্রতি বছর ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের তালিকা হালনাগাদ করিবে এবং বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন প্রতিবেদন বা পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা

সংস্থার ন্যূনতম যোগ্যতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে ও এই সংক্রান্ত তালিকা প্রস্তুত, অনুমোদন এবং হালনাগাদ করিবে।

- **অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তি**

ধারা ১৫ক

আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লজ্ঘনের ফলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, অথবা তাহাদের পক্ষে মহাপরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

২.৪ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং বিচারিক ব্যবস্থাঃ

২.৪.১ মৌলিক অধিকার ও হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে পরিবেশের অধিকারকে সর্বোচ্চ আদালত জীবনের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে ১ জুলাই, ১৯৯৬ তারিখে প্রদত্ত ৯২/১৯৯৬ নং রিট মামলার রায়ের মাধ্যমে এবং জীবনের অধিকারগুলোকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে। এ অধিকারগুলোর যে কোন একটির বা সব কয়টির লজ্ঘন হলে কোন ব্যক্তি সর্বোচ্চ আদালতে (হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট) সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বলে রিট মামলা দায়ের করিতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন। এ আইনের সাথে অন্য কোন আইনের যদি অসামঞ্জস্য হয় তবে, যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, ততটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে (অনুচ্ছেদ ৭)।

২.৪.২ পরিবেশ ও জনস্বার্থে মামলাঃ

২৫ জুলাই, ১৯৯৬ তারিখে একটি রিট মামলায় (মামলা নং ৯৯৮/৯৪) রায়ে আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, উল্লেখ করে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ (১) মৌলিক অধিকার বলবৎ করার একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তি একাকী ভোগ করিতে পারেন যদি তার ব্যক্তিগত অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকে, কিন্তু তা একজন ব্যক্তি কর্তৃক অন্যদের সাথে অংশীদারিত্বেও ভোগ করিতে পারেন যখন অধিকারগুলো সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে এবং ভৌগলিক সীমানার মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং বিস্তৃত হবে। আদালত আরোও বলে যেখানে গণ-অপরাধ অথবা গণ- ক্ষতিগ্রস্ততা অথবা অসংখ্য জনগণের মৌলিক অধিকার লজ্ঘিত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে জনগণের যে কোন একজন সদস্য, যিনি একজন নাগরিক, যিনি সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ততা অথবা অন্যান্যগনের সাথে সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার হইয়াছেন অথবা যে কোন নাগরিক অথবা দেশিয় কোন সমিতি যা কোন বিদেশি সংস্থার স্থানীয় অঙ্গ সংগঠন হতে পৃথক সমর্থন দান করার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট কারণে একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হন এবং অনুচ্ছেদ ১০২ এর অধীনে এখতিয়ার ভোগ করার অধিকারী হবেন। এ মামলার মাধ্যমেই বাংলাদেশে জনস্বার্থে মামলা করার অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়।

২.৪.৩ পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০

পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ এ নিম্লোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ রয়েছে।

ধারা ৫(২)

পরিবেশ আইনে বর্ণিত সকল অপরাধের মামলা বিচারের জন্য সরকার, সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ১ম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে কোন নির্দিষ্ট

এলাকার জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট রূপে নিয়োগ দান করিতে পারিবে।

ধারা ৬(১)

অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনে বর্ণিত সকল অপরাধের বিচারের জন্য মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরাসরি মামলা দায়ের করিতে পারিবেন অথবা ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে থানায় এজাহার দায়ের করিতে পারিবেন।

ধারা ৬(২)

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন অপরাধসহ পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্ত বা বিলিবন্দোবস্ত করার আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথাঃ -

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহাপরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদানঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহাপরিচালককে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

ধারা ৬(৩)

পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই অথবা উক্ত অভিযোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহাপরিচালককে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

- **পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার**

ধারা ৭(১)

অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধসমূহ বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে প্রাপ্ত মামলাসমূহ এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালত কর্তৃক বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে।

ধারা ৭(২)

পরিবেশ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করিতে হইবে এবং তাহা উক্ত আদালতে বিচারার্থ গ্রহণ, বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ উহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে।

ধারা ৭(৩)

পরিবেশ আদালত এই আইনের ধারা ৮(২) এর অধীন অপরাধসহ পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্ত বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহাপরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদান:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহাপরিচালককে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

ধারা ৭(৪)

পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের দাবি বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কোন ক্ষতিপূরণের দাবি গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবি বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহাপরিচালককে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ

দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে দাবি সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২.৪.৪ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এ নিম্নোক্ত বিষয় উল্লেখ রয়েছে:

- **আপিলের বিধান**

ধারা ১৪(১)
এই আইন বা বিধি অনুসারে প্রদত্ত কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারিবেন এবং আপিলের উপর উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হইবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপিল দায়ের করিতে পারেন নাই তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ আপিল দাখিলের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

ধারা ১৪ (২)
উপ ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপিল কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক সদস্য সমম্বয়ে গঠন করা যাইবে: তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন আপিল কর্তৃপক্ষ একাধিক সদস্য সমম্বয়ে গঠন করা হয় তাহা হইলে উহার একজন সদস্যকে সরকার উক্ত কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবে।

ধারা ১৪(৩)
এই ধারার অধীন দায়েরকৃত আপিল দায়েরের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে।

- ***আপিল কর্তৃপক্ষ:***

৩ নভেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন নং- পবম-৪/৩/২/৯৭/৬১২ জারি করে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ধারা ১৪-এর অধীন নিম্নরূপ আপিল কর্তৃপক্ষ গঠন করিয়াছে-

১। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	চেয়ারম্যান
২। যুগ্ম সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩। উপ-সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

- ***ক্ষতিপূরণের দাবি***

ধারা ১৫ক
এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘনের ফলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, অথবা তাহাদের পক্ষে মহাপরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

২.৪.৫ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ রয়েছে-

- **আপিল**

বিধি ৯(১)
ধারা ১৪ এর অধীন যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইবে, তৎসম্পর্কে আপত্তির কারণসমূহ সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

বিধি ৯(২)
প্রত্যেকটি আপিলের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র থাকিতে হইবে, যথা:- যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইতেছে উহার একটি করিয়া প্রমাণকৃত কপি; পরিবেশগত ছাড়পত্রের কপি (যদি থাকে); আপিল ফি বাবদ এক হাজার টাকা জমা প্রদনের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান; এবং আপিলের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্য কোন কাগজাদি।

- ***আপিল শুনানিকালীন পদ্ধতি***

বিধি ১১(১)
শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখে, অথবা শুনানি মুলতবি হইলে পরবর্তী তারিখে আপিলের সমর্থনে আপিলকারীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে;

বিধি ১১(২)
শুনানির জন্য ধার্য তারিখে অথবা শুনানি মুলতবি হইলে পরবর্তী তারিখে আপিল শুনানির জন্য ডাক পড়িলে যদি আপিলকারী হাজির না হয়, তাহা হইলে আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল খারিজের আদেশ দান করিতে পারিবে;

বিধি ১১(৩)
যদি আপিলকারী হাজির হয়, কিন্তু প্রতিপক্ষ হাজির না হয়, তবে একতরফাভাবে আপিলের শুনানি হইবে;

বিধি ১১(৪)
উপ-বিধি (২) অনুসারে আপিল খারিজ হয় তবে আপিলকারী উক্ত খারিজের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে পুনরায় আপিল মঞ্জুরের জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবে;

বিধি ১১(৫)
আপিল কর্তৃপক্ষ পক্ষগণ বা কোন এক পক্ষের শুনানির পর তর্কিত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ অনুমোদন, রদবদল বা বাতিল করিতে পারিবে;

বিধি ১১(৬)
আপিল কর্তৃপক্ষ তাহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তিযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আপিলকারী কী প্রতিকার প্রাপ্য হইবেন তাহা উল্লেখ করিবে; এবং

বিধি ১১(৭)
আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের কপি যথাশীঘ্র সম্ভব আপিলকারী, অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় এবং মহাপরিচালক বরাবরে প্রেরণ করা হইবে।

২.৪.৬ *ইটভাটা আইন ও আদালত*

- **বিচারিক আদালত, অপরাধ আমলে গ্রহণ, বিচার, ইত্যাদি**

ধারা ১৯

মোবাইল কোর্ট আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ভ্রাম্যমাণ আদালত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ আমলে গ্রহণ করিয়া তাৎক্ষণিক বিচারের মাধ্যমে দণ্ডারোপ করিতে পারিবে। পরিবেশ আদালত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ আদালত বা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ আমলে গ্রহণ ও উহার বিচার করিতে পারিবে না । এখানে "ভ্রাম্যমাণ আদালত" অর্থ মোবাইল কোর্ট আইনের ধারা ৪ এ উল্লিখিত মোবাইল কোর্ট।

এই অধিবেশনে প্রদত্ত বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি এবং বিচারিক ব্যবস্থা নিম্নের টেবিলে তুলে ধরা হলো-

আইন	ধারা	অপরাধ	শাস্তি	আদালত
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)	ধারা ৫(১)	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা।	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	পরিবেশ আদালত।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)	ধারা ৬(১)	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন ব্যবহার।	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড; দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড	পরিবেশ আদালত।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)	ধারা ৬ক	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদি।	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ।	পরিবেশ আদালত।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)	ধারা ৬খ	কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন।	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ।	পরিবেশ আদালত।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)	ধারা ৬গ	ঝুঁকিপূর্ণ বজ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, সরবরাহ, পরিবহণ, আমদানি, রপ্তানি, পরিত্যাগকরণ (Disposal), ডাম্পিং, ইত্যাদি।	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ।	পরিবেশ আদালত।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী,	ধারা ৬ঘ	জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কারণে সৃষ্ট দূষণ।	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর	পরিবেশ আদালত।

আইন	ধারা	অপরাধ	শাস্তি	আদালত
২০১০)			কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)	ধারা ৬(ঙ)	জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করা।	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ।	পরিবেশ আদালত।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)	ধারা ৭(১)	ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ।	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ।	পরিবেশ আদালত।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)	ধারা ৯	অতিরিক্ত পরিবেশ দুষক নির্গমন ইত্যাদি।	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ।	পরিবেশ আদালত।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)	ধারা ১০(২)	মহাপরিচালককে বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে, সাহায্য সহযোগিতা না করা।	অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ।	পরিবেশ আদালত।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)	ধারা ১২	পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা।	অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা, অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ।	পরিবেশ আদালত।
বাংলাদেশ পরিবেশ	ধারা ১৫	এই আইনের অন্য কোন বিধান বা বিধির অধীনে	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা	পরিবেশ আদালত।

আইন	ধারা	অপরাধ	শাস্তি	আদালত
সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধনী, ২০১০)		প্রদত্ত কোন নির্দেশ লঙ্ঘন বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাধা প্রদান বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব সৃষ্টি করা।	উভয় দণ্ড	
ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩	ধারা ৪	ইটভাটা যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে, ইটভাটায় ইট প্রস্তুত করা।	অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	মোবাইল কোর্ট, পরিবেশ আদালত, বা ক্ষেত্রমত, ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।
ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩	ধারা ৫(১)	ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা হইতে মাটি কাটিয়া বা সংগ্রহ করিয়া ইটের কাঁচামাল হিসাবে উহা ব্যবহার করা।	অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	মোবাইল কোর্ট,পরিবেশ আদালত, বা ক্ষেত্রমত, ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।
ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩	ধারা ৫(২)	মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাঁওড় বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হতে মাটি কাটতে বা সংগ্রহ করা।	অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদদণ্ড অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	মোবাইল কোর্ট, পরিবেশ আদালত, বা ক্ষেত্রমত, ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।
ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩	ধারা ৫(৩)	ইটের কাঁচামাল হিসাবে মাটির ব্যবহার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ ফাঁপা ইট (Hollow Brick) প্রস্তুত না করা।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড (ধারা ১৫)।	মোবাইল কোর্ট, পরিবেশ আদালত, বা ক্ষেত্রমত, ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।
ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩	ধারা ৫(৪)	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত উপজেলা বা ইউনিয়ন বা গ্রামীণ সড়ক ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি ভারি যানবাহন দ্বারা ইট বা ইটের কাঁচামাল পরিবহন করা ।	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড ।	মোবাইল কোর্ট, পরিবেশ আদালত, বা ক্ষেত্রমত, ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।
ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ)	ধারা ৬	ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসাবে কোন	অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	মোবাইল কোর্ট, পরিবেশ আদালত, বা ক্ষেত্রমত,

আইন	ধারা	অপরাধ	শাস্তি	আদালত
আইন, ২০১৩		জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করা ।		ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।
ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩	ধারা ৭	ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, এ্যাশ, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা।	অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড।	মোবাইল কোর্ট, পরিবেশ আদালত, বা ক্ষেত্রমত, ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

তৃতীয় অধিবেশন	বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা

১. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে;

২. এ অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের প্রকৃত অবস্থা ও এর ব্যবস্থাপনায় আইন, বিধি, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা কী আছে তা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের বিস্তারিত ধারণা দেয়া।

উপকরণ ঃ হ্যান্ডআউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার পেন, পোস্টার, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন।

সময় ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ

প্রশিক্ষক এই অধিবেশনে-

- প্রথমে বন ও বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে ওই এলাকার বন ও বন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত আঞ্চলিক সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করবেন;
- এরপর চিহ্নিত আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতি সমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরবেন এবং আলোচনা করবেন;
- আইন, বিধি ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ /প্রতিষ্ঠান সমূহ, তাদের কাঠামো ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দিবেন;
- এবং আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি সমূহ ভঙ্গ হলে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা, ক্ষতিগ্রস্থের জন্য প্রতিকার ও দোষী ব্যক্তির জন্য শাস্তি বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন ।

৩.১ বাংলাদেশের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা

বন সংক্রান্ত আইনসমূহে বনের সংজ্ঞা প্রদান করা না হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে বন হচ্ছে সৃজিত বাগান ব্যতীত সেই প্রাকৃতিক সম্পদ যা বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং সরকার কর্তৃক চিহ্নিত প্রতিবেশ ব্যবস্থা যেখানে বিচিত্র গাছ-গাছালি, উদ্ভিদ সম্ভার ও জীববৈচিত্র্য টিকে থাকতে এবং বন্যপ্রাণী বসবাস করিতে পারে। প্রাকৃতিক বনকে মূলত তিনটি মূল শ্রেণিতে বিভাজন করা হইয়াছে যার মধ্যে রয়েছে পাহাড়ি, ম্যানগ্রোভ এবং সমতলের শালবন। এ তিন ধরনের বন ছাড়াও হাওর এলাকায় সোয়াম্প বন হিসেবে আরও এক ধরনের বনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

বন ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সরকার এ বনগুলোকে বিভিন্ন সময় সংরক্ষিত, রক্ষিত, সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট, গ্রামীণ, নোটিফাইড এবং আতিয়া বন হিসেবে ঘোষণা করা হইয়াছে। বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী দেশে বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট বনভূমির পরিমাণ ১.৫২ মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের মোটভূমির ১০.৩%। প্রতিবছর বন ধ্বংসের পরিমাণ ৩% (Forestry Sector Master Plan, 1993-2012)।

বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত বন বিভাগ বর্তমানে নার্সারি, সামাজিক বনায়ন, বনায়ন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার আদলে বন ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এ ব্যবস্থাপনাগুলোর মধ্যে অধিক প্রসার লাভ করেছে সামাজিক বনায়ন। বর্তমানে ৪.৬৫ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি এ বনায়নের আওতায় আনা হইয়াছে যা দেশের মোট ভূমির ৩১%। তবে, বর্তমানে সহ-ব্যবস্থাপনাও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, বন বিভাগ যেভাবেই বন ব্যবস্থাপনা করে থাকুক না কেন সেখানে বনবাসীদের সম্পৃক্ত করিতে হবে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করিতে হবে, যেসব জীববৈচিত্র্য ইতোমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে সেগুলো ফিরিয়ে আনতে হবে। আর এসবকিছু তখনই সম্ভব যখন দেশে প্রাকৃতিক বন ফিরে আসবে।

৩.২ বন ,বন ব্যবস্থাপনা এবং আইন, নীতি ও কেইস স্টাডি

বর্তমানে বন বিভাগ বন আইন, ১৯২৭; বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ নিরাপত্তা) আইন, ২০১২; সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধনী, ২০১০); এবং বন নীতি, ১৯৯৪-এর বিধান সাপেক্ষে বন ব্যবস্থাপনা করে থাকে। তবে, পার্বত্য এলাকার জন্য কিছু বিশেষ আইনি কাঠামো রয়েছে যেমন-১৯০০ সালের শাসন বিধি।

৩.২.১ বন আইন, ১৯২৭

বন, বনজদ্রব্য স্থানান্তরকরণ এবং কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের উপর শুল্ক আরোপ সম্পর্কিত আইনসমূহ একত্রিকরণের উদ্দেশ্যে বন আইন ১৯২৭ প্রণীত হলেও এ আইন অনুযায়ী কোন বন চূড়ান্তভাবে রিজার্ভ ঘোষণার পূর্বে জনগণের ভূমিতে বা তার উপর চলাচলের অধিকার বা পশুচারণের অধিকার বা বনজদ্রব্য বা পানি প্রবাহের অধিকার, ভুমির অধিকার ও চাষাবাদের অধিকার (ধারা ৫ ও ১১), জুম চাষের অধিকার (ধারা ১০), পশুচারণ ও বনজ দ্রব্যের অধিকার (ধারা ১২) এবং পানি প্রাপ্তির অধিকার (ধারা ২৫) সংক্রান্ত সকল দাবি নিস্পত্তি করিতে হবে। কোন রিজার্ভ বনের ভিতর রাস্তা বা পানি প্রবাহ বন্ধ করার পূর্বে বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করা বাধ্যতামূলক (ধারা ২৫)। এ আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বনের যে আইনগত বিভাজন, নিষিদ্ধ ও অনুমোদিত কার্যক্রম প্রদান করা হইয়াছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- **সংরক্ষিত বন** (Reserve Forest):

ধারা ২০

বন আইন, ১৯২৭-এর ২০ ধারার বিধান মোতাবেক সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোন বনভূমি বা পতিত ভূমি বা যে কোন ভূমি যা বনায়নের উপযোগী এবং যাতে সরকারের মালিকানাধীন স্বত্ত্ব রয়েছে এরূপ বনকেই সংরক্ষিত বন বলা হয়। কোন বনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করিতে চাইলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করবে যেখানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচ্য হবে (Hasan, S, Rizwana and Sultana, Zakia, 2009) : -

- উল্লেখ থাকবে যে উক্ত ভূমিকে সংরক্ষিত বন ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে;
- উক্ত ভূমির অবস্থান ও সীমানা, যতদূর সম্ভব নির্দিষ্ট করা; এবং
- উক্ত ভূমিতে বনভূমির সীমানার মধ্যে বা উপরে কোন ব্যক্তির অনুকূলে উক্ত ভূমিতে বা উহার বনজদ্রব্যের উপর উপস্থাপিত কোন অধিকারের অস্তিত্ব, প্রকৃতি ও সীমা নির্ধারণ করার জন্য এবং তদন্ত করার জন্য একজন বন ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (Forest Settlement Officer) নিয়োগ প্রদান করিতে হইবে।

- *সংরক্ষিত বনে নিষিদ্ধ কার্যক্রম এবং ক্ষতিপূরণ :*

ধারা ২৬
সংরক্ষিত বনে নিম্নলিখিত সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ

- বনে অগ্নিসংযোগ;
- অনধিকার প্রবেশ করে গবাদি পশু চরাণো;
- বন থেকে কাঠ অপসারণ করা;
- বৃক্ষের বাকল তোলা বা বাকল চেঁছে রস সংগ্রহ করা, আইন বহির্ভূত ভাবে কাঠ সংগ্রহ করা;
- বৃক্ষ কিংবা কাঠ কাটার সময় অবহেলা বশত বনের ক্ষতি সাধন করা;
- পাথর উত্তোলন, কাঠ, কয়লা বা কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য কাঠ ছাড়া অন্য কোন বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করা বা সরানো;
- চাষাবাদ বা অন্য কোন উদ্দেশে বন উজাড় করা; এবং
- অনুমোদন ছাড়া শিকার করা, গুলি করা, মাছ মারা, পানি বিষাক্ত করা, ফাঁদ পাতা।

উপরোক্ত কার্যক্রম করে বনের ক্ষতি সাধন করার জন্য নিম্নে ছয়মাস পর্যন্ত ও উর্ধ্বে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং নিম্নে পাঁচ হাজার টাকা ও উর্ধ্বে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে।

- **বন অধিকার দাবির নিষ্পত্তি**

ধারা ১৬
'রিজার্ভ বনের ব্যবস্থাপনা' যদি ফরেস্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার কাছে প্রতীয়মান হয় যে 'রিজার্ভ বনের ব্যবস্থাপনা'-এর স্বার্থে কোন স্বীকৃত অধিকারের চর্চা অব্যাহত রাখার অনুমতি দেয়া অসম্ভব তবে সে অধিকারের বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ, ভূমি বা অন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হইবে। ১৬ ধারার অধীনে কোন অধিকারে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তাকে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসরণ করিতে হইবে ।

- *আপিল*

ধারা ১৭:
ফরেস্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার সকল আদেশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল করা যায় ।

- **রিজার্ভ (সংরক্ষিত) বন ঘোষণা**

ধারা ২০:
সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোন বনভূমি বা পতিত ভূমিকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা যায়।

- **রিজার্ভ (সংরক্ষিত) বনের উপর অধিকার অর্জন**

ধারা ২৩:
বন আইনের ২৩ ধারানুযায়ী, ২০ ধারার আওতায় রিজার্ভ বন ঘোষণা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর উত্তরাধিকার বা সরকার কর্তৃক লিখিত চুক্তি বা অনুদান ব্যতীত কিংবা প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার সময় প্রজ্ঞাপিত ভূমিতে কারো কোন অধিকার বর্তানো থাকলে তা ব্যতীত অন্য কেউ সংরক্ষিত বনের উপর কোন অধিকার অর্জন করিতে পারবে না।

- **সংরক্ষিত বনে চলাচল ও পানি সংগ্রহের উপর নিষেধাজ্ঞা**

ধারা ২৫:
ফরেস্ট অফিসার সরকার বা অন্য কোন সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে বনের মাঝে হাটা চলা বা পানি সংগ্রহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারেন। উল্লেখ্য এইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে বিকল্প সুবিধাজনক কোন পথ দিয়ে হাঁটাচলা বা উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করা যাইবে তাও বলে দিতে হইবে। যদি এরূপ পথ বা পানি সংগ্রহের কোন উৎস না থাকে তবে নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বে তা তৈরি করে দিতে হইবে।

- **রিজার্ভ (সংরক্ষিত) বন বা তার অংশ বিশেষ অবমুক্ত করা**

ধারা ২৭:
কোন রিজার্ভ বন বা তার অংশ বিশেষ পরবর্তীতে প্রদেয় গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক অবমুক্ত করা সম্ভব (ধারা ২৭)।

- **২০ ধারার অধীনে সংরক্ষিত বন ঘোষণা সংক্রান্ত কেইস স্টাডি**

কেইস স্টাডি-২

"রাঙামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার ৩৩৪ নং কুক্যাছড়ি এবং ৩৩৫ নং ধনুছড়ি মৌজায় দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করে আসছিল ২২০টি (সরকারি হিসাব অনুযায়ী) পরিবার। এ আদিবাসী পরিবারগুলো ৯০ শতাংশই প্রথাগত জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। ১৯৯২ সালে উল্লেখিত মৌজার ৩৬৮৯.৩৩ একর আবাদি জমি, জুম ভূমি, পাড়াবন, চারণ ও শ্মশান ভূমি সংরক্ষিত বন ঘোষণা করার লক্ষ্যে ৪ ও ৬ ধারায় নোটিশ জারি করা হয়। উল্লেখিত মৌজায় বন আইন অনুযায়ী ৪ ও ৬ ধারার নোটিশ জারি করা হলে জনগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর তাদের আপত্তি ও দাবি উথাপন করে। জনগণের দাবি নিষ্পত্তি না করে পরবর্তীতে বন আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী ৩৩৫ নং ধনুছড়ি মৌজার সকল ভূমি চুড়ান্ত ভাবে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় বাসিন্দাগণ তাদের আইনি দাবির আলোকে আন্দোলন শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

তদন্ত কমিটি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ১৯৯৩/৯৪ সালে জুম ভূমিতে যে সমস্ত গাছ রোপণ করা হয়েছিল সে সমস্ত গাছ এখন পরিপক্কতা লাভ করেছে এবং উক্ত জমি রিজার্ভ ঘোষণা করা যায় মর্মে সুপারিশ করে। তদন্ত কমিটির উপরোক্ত পরামর্শ ও সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও গাছ কেটে সেখানে পুনরায় চারা লাগানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করলে স্থানীয় বাসিন্দাগণ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর তদন্ত কমিটির প্রস্তাব ও সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য আবারও আবেদন করে। স্থানীয় জনসাধারণ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বারবার আবেদন করলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অদ্যাবধি কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং নিজেদের নূন্যতম অধিকার আদায় করতে উক্ত মৌজাসমূহে বসবাসরত বনবাসীদের পক্ষ হতে মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করা হয় (মামলা ২৯৮০/২০১৩)। মামলার প্রেক্ষিতে আদালত উল্লেখিত এলাকায় বসবাসরত বনবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ না করে বন বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত গেজেট, প্রজ্ঞাপণ এবং রিপোর্ট কেন বেআইনি এবং আইনবর্হিভূত ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে বিবাদিগণের উপর রুল জারি করেছে। একইসাথে উক্ত এলাকায় বসবাসরত বনবাসীদের দাবি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বন আইন, ১৯২৭-এর ধারা ১৬ অনুযায়ী বিধি প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করা হবে না তাও জানতে চেয়েছেন আদালত।"

তথ্যসূত্র: কেইসটি বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) দায়েরকৃত রিট মামলা থেকে সংগৃহীত

- **রক্ষিত বন** (Protected Forest)

ধারা ২৯:
বনজপণ্য রক্ষা, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বন আইন ১৯২৭-এর ২৯ ধারার বিধান মোতাবেক ঘোষিত যেকোন সরকারি বনভূমি যা রিজার্ভ নয় তাকেই রক্ষিত বন বলে।

- **রক্ষিত বনে নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম**

ধারা ৩২:
রক্ষিত বনে সরকার বিধি দ্বারা নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে (ধারা ৩২):-

- গাছ বা কাঠ কাটা, সংগ্রহ ইত্যাদি;
- বনজদ্রব্য সরানো;
- বন সংলগ্ন শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের গাছ, কাঠ বা অন্যান্য বনজদ্রব্য সংগ্রহের স্বার্থে লাইসেন্স প্রদান;
- বাণিজ্যিক স্বার্থে গাছ কাটা বা সরানো বা অন্যান্য বনজদ্রব্য সংগ্রহের লাইসেন্স প্রদান এবং এসকল লাইসেন্স প্রাপ্তদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ;
- বনজদ্রব্য সরানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ;
- ঘাস কাটা বা গোচারণ নিয়ন্ত্রণ;
- চাষাবাদের স্বার্থে বনভূমির ব্যবহার;
- বন ও কাঠকে আগুন থেকে রক্ষা; এবং
- শিকার, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা এবং ফাঁদ পাতা।

ধারা ৩৩ অনুসারে যদি কেউ এ ধারা লঙ্ঘন করে উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন তবে তিনি ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা প্রদানেও দায়ী হইবেন, তদুপরি দণ্ড প্রদানকারী আদালত বনের ক্ষতি সাধন করার জন্য যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন, এরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

- **বন অপরাধ এবং শাস্তি**

ধারা ৩৩:
কোন ব্যক্তি নিম্নের যে কোন একটি অপরাধ করেন-

ক) ধারা ৩০ এর অধীন নিষেধ লঙ্ঘন করে পাথর উত্তোলন, অথবা চুন বা কাঠ কয়লা পোড়ায় বা কাঠ ব্যতীত অন্য কোন বনজদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সাপেক্ষে সংগ্রহ বা অপসারণ করে;

খ) প্রজ্বলিত কোন অগ্নি, রক্ষিত বনের নিকট রেখে যায়;

গ) কোন বৃক্ষ পাতিত করিতে বা কাঠ কর্তন করিতে বা টানতে অবহেলা বশত কোন ক্ষতি করে বা কোন ভূমি অন্য কোনভাবে চাষ করে বা চাষ করবার উদ্যোগ গ্রহণ করে;

ঘ) গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশ করান বা চরান, বা গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন;

ঙ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে আগ্নেয়াস্ত্রসহ কোন রক্ষিত বনে প্রবেশ করে;

চ) ধারা ৩২ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি লঙ্ঘন করে;

ছ) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত বা ক্ষতি বা অপরাধ হিসেবে গণ্য কোন অপরাধ করে; তাহলে সে, বনের ক্ষতি সাধনের জন্য দণ্ড প্রদানকারী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশের অতিরিক্ত, অনধিক ছয় মাস মেয়াদে কারাদণ্ড এবং অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

আবার কোন ব্যক্তি যদি নিম্নের যে কোন একটি অপরাধ করে যথা:

ক) যদি কোন রক্ষিত বনে অগ্নি সংযোগ করে; বা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে বা বন বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ কোন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রেখে যায়;

খ) সংরক্ষিত কোন বৃক্ষ পাতিত করে, রিং আকারে বাকল তোলে, ডালপালা কাটে, বাকল চেঁছে রস সংগ্রহ করে বা বাকল তোলে বা পাতা ছিঁড়ে বা অন্য কোন প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতি সাধন করে;

গ) চাষের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণে রক্ষিত বনে কোন ভূমি পরিষ্কার করে বা ভাঙ্গে;

ঘ) বিধি লঙ্ঘন করে শিকার করেন, গুলি ছোঁড়েন, ফাঁস বা ফাঁদ পাতেন বা বন্যপ্রাণী এবং পাখি, বা মাছ ধরে বা বধ করে বা পানি বিষাক্ত করে;

ঙ) আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতীত রক্ষিত বনে কাঠ চিরানোর জন্য কোন গর্ত করে বা করাতের আসন তৈরি করে বা বৃক্ষকে কাঠে রূপান্তরিত করে;

চ) রক্ষিত বন হতে কোন কাঠ অপসারণ করে।

তবে সে ব্যক্তি বনের ক্ষতি সাধনের জন্য দণ্ড পাইবেন। দণ্ড প্রদানকারী আদালত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ অথবা অন্যূন ছয় মাস এবং অনধিক পাঁচ বছর মেয়াদে কারাদণ্ড এবং অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করিবে।

- **জামিন অযোগ্য অপরাধ**

ধারা ৬৩ ক:

আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা'ই থাকুক না কেন ২৬ ধারার (১ক) উপধারা, ৩৩ ধারার (১ক) উপধারা এবং ৬৩ ধারায় উল্লেখিত শাস্তি যোগ্য অপরাধগুলোকে বন অপরাধ হিসেবে গণ্য করে তা জামিন অযোগ্য করা হইয়াছে (ধারা ৬৩ ক) ।

- *সংরক্ষিত বন এবং চিংড়ি চাষ-*

কেইস স্টাডি-৩

কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার ঘটিভাঙ্গার সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার পুরান খালের দুইপাশে ঘন বাইন ও কেওড়া গাছের সারি। অত্র এলাকায় বিএস ৩৩৮১ দাগের অন্তর্ভুক্ত পাঁচ হাজার ৫৫৯ একর প্রাকৃতিক বনভূমিকে বনাঞ্চল নেই উল্লেখ করে ক্রমান্বয়ে চিংড়ি চাষের জন্য ইজারা দেওয়ার প্রস্তাব করে স্থানীয় ভূমি অফিস। ইতোপূর্বে ২০০৬-০৭ সালে একই প্রক্রিয়ায় একই দাগে ১০৯ একর বনভূমি ইজারা প্রদান করা হয় চিংড়ি চাষের জন্য। উপকূলীয় বন বিভাগে সংরক্ষিত নথি বিশ্লেষনে দেখা যায় উল্লেখিত এলাকাটি বন আইন, ১৯২৭-এর ৪ ধারায় ঘোষিত সংরক্ষিত বনভূমি। উপকূলীয় বন বিভাগ পত্র মারফত বনভূমিতে ইজারা বাতিল করার অনুরোধ জানানো হয় বার বার। এতদসত্ত্বেও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে পূর্বে দেওয়া ইজারা বাতিল না করে বরং নতুন করে আরোও বনভূমি ইজারা প্রদানের সুপারিশ করে। পরবর্তীতে উপকূলীয় বন সংরক্ষণে একটি রিট মামলা (নং-৭৪৮৩/২০১২) দায়ের করে যা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে।

উক্ত মামলার প্রাথমিক শুনানি শেষে আদালত কক্সবাজার জেলাধীন চিহ্নিত সকল বনভূমি চিংড়ি চাষের জন্য ইজারা প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। ইতোপূর্বে কৃষি জমি ও বনভূমিতে চিংড়ি চাষ বন্ধে বেলা কর্তৃক দায়েরকৃত অপর এক রিট মামলার (মামলা নং ৫৭/১০) চূড়ান্ত শুনানি শেষে গত ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে আদালত কৃষি জমি ও বনভূমিতে লোনা পানির চিংড়ি চাষ প্রতিহত করতে নির্দেশ প্রদান করে। একইসাথে আদালত দেশে বনভূমির অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করে লোনা পানি থেকে বনভূমি সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছে। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও গত ১১ জুলাই, ২০১৩ তারিখে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার ৬ টি উপজেলায় অর্থাৎ চকোরিয়া উপজেলায় ২৫.৭৩৪.০২ একর, রামু উপজেলায় ১৭.৬৩ একর, কক্সবাজার সদর উপজেলায় ১৫৯২.৬২ একর, উখিয়া উপজেলায় ২২৩.৭১ একর, টেকনাফ উপজেলায় ২০৮৬.০৮ একর এবং মহেশখালী উপজেলায় ৫০১৩.৭২ একর জমি চিংড়ি মহাল হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ কেইসটি বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) দায়েরকৃত রিট মামলা থেকে সংগৃহীত

- **গ্রাম বন**

ধারা ২৮:

গ্রামবন বলতে বোঝায় ২৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ঘোষিত কোন বন। এ ধারায় কোন রিজার্ভ বনের উপর সরকারের কর্তৃত্ব বা অধিকার কোন গ্রাম সম্প্রদায়কে অর্পণ করার বিধান রাখা হইয়াছে। রিজার্ভ বনে সরকারের অধিকার কোন গ্রাম সম্প্রদায়কে হস্তান্তর করা হলে, সে গ্রাম সম্প্রদায় উক্ত বন ব্যবস্থপনা করিবে। সরকার এ বন ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিবে এবং প্রণীত বিধিতে বনের উপর গ্রাম সম্প্রদায়ের অধিকার ও বন রক্ষায় তাদের কর্তব্যের উল্লেখ থাকিবে। মূলত জীবন ও জীবিকার স্বার্থে প্রথাগতভাবে বনের উপর নির্ভরশীল এমন গ্রাম সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতেই আইনের এ বিধান। উল্লেখ্য সরকার ঘোষিত গ্রাম বন বাতিলও করিতে পারেন।

- **সামাজিক বনায়ন**

ধারা ২৮ক:
বন আইনের ২০০০ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে বন আইন, ১৯২৭-এ দুটি ২৮ক এবং ২৮খ ধারা সংযোজন করে সামাজিক বনায়নের বিধান প্রবর্তন করা হয়।

ধারা ২৮ক (১)
যে কোন ভূমি যা সরকারি সম্পত্তি বা যার উপর সরকারের স্বত্বাধিকার রয়েছে, এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনায়ন, সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনার জন্য মালিক কর্তৃক স্বেচ্ছায় লিখিত চুক্তির মাধ্যমে সরকারকে অর্পণ করা হইয়াছে এমন যে কোন প্রকার ভূমিতে সরকার এর আওতায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

ধারা ২৮ক (২)
একটি সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সরকার সামাজিক বনায়নের জন্য এরূপ ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজে সহায়তাকারী ব্যক্তিগণকে এক বা একাধিক লিখিত চুক্তি দ্বারা বনজদ্রব্যের অধিকার বা ভূমি ব্যবহারের অধিকার অর্পণ করে।

ধারা ২৮ক (৩)
সরকারি মালিকানাধীন ভূমি সংশ্লিষ্ট চুক্তি স্থানীয় খতিয়ানে নিবন্ধন করার প্রয়োজন নেই, এবং এরূপ অনিবন্ধনকৃত চুক্তির কোন পক্ষ সরকার কর্তৃক অপর কোন ব্যক্তিকে অধিকার অর্পণের কারণে বঞ্চিত হইবে না।

ধারা ২৮ক (৪)
সামাজিক বনায়ন চুক্তি এবং কর্মসূচির নমুনা বিন্যাস করার জন্য সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারে। উল্লেখ্য পরবর্তীতে এ ধারার ক্ষমতা বলে ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং ২০১০ সালে এর সংশোধনী আনে। এ বিধিমালার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধান নিম্নে আলোচনা করা হলো-

৩.২.২ *সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪*

- ***স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়ন***

বিধি ৫ক:
এ বিধিমালা অনুযায়ী সামাজিক বনায়নে আগ্রহী স্থানীয় জনগোষ্ঠী বন বিভাগের বিট ও রেঞ্জ কার্যালয়ের মাধ্যমে বা সরাসরি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কাছে নির্ধারিত ফরমেটে লিখিত আবেদন করিতে পারিবে এবং আবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উপকারভোগী চিহ্নিত করিতে এবং উপকারভোগীগণকে বনায়নের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করিতে সহায়তা প্রদানের জন্য, ফরেস্ট রেঞ্জারের নীচে নয় এরূপ একজন বনকর্মকর্তা নিয়োগ করিবে। বন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং আবেদনকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যূনতম দুইজন প্রতিনিধি, যাদের একজন মহিলা থাকিবে, সমন্বয়ে গঠিত কমিটি উপকারভোগীদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্ত হইবার পর সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে প্রতিবেদন দাখিল করিবে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বনের সাথে নির্বাচিত উপকারভোগীদের সম্পর্ক এবং বনায়ন কার্যক্রমে শ্রম বিনিয়োগের প্রদানের সামর্থ যাচাই করিবে। যাচাইয়ের পর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সামাজিক বনায়নের লক্ষ্যে উপকারভোগী নির্বাচনের চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। উপকারভোগী নির্বাচনের পর এবং চুক্তি স্বাক্ষরের

পর, বিভাগীয় বন কমকর্তা, নির্বাচিত উপকারভোগী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নির্ধারিত ফরমেটে সামাজিক বনায়নের অনুমতি প্রদান করিবে।

- **উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি**

বিধি ৬:
স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহিত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি উপকারভোগী নির্বাচন চূড়ান্ত করিবে এবং সাধারণভাবে কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার এক বর্গকিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য হতে উক্ত এলাকার উপকারভোগী নির্বাচিত হইবে এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উপকারভোগী নির্বাচনে প্রাধিকার পাইবে, যথা:-

(ক) ভূমিহীন;
(খ) ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক;
(গ) দুস্থ মহিলা;
(ঘ) অনগ্রসর গোষ্ঠী;
(ঙ) দরিদ্র আদিবাসী;
(চ) দরিদ্র ফরেস্ট ভিলেজার; এবং
(ছ) অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা অথবা মুক্তিযোদ্ধার অসচ্ছল সন্তান।

কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপকারভোগী না পাওয়া গেলে উক্ত এলাকার নিকটতম এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীগণের মধ্য হইতে উপকারভোগী নির্বাচন করা যাইবে। নির্বাচিত উপকারভোগীকে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করিতে আগ্রহী হইতে হইবে।

- **উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা ইত্যাদি হস্তান্তর**

বিধি ৭:
উপকার ভোগীগণ এই বিধিমালার অধিনে সম্পাদিত চুক্তির আওতাই তাহার দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা তাহাদের স্ব স্ব স্ত্রিদের অথবা স্বামীদের অথবা যে কন উত্তরাধিকারীদেরকে হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং কোন উপকারভোগীর মৃত্যুতে তাহার দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধাসমূহ তার উত্তরাধিকারগণ কর্তৃক মনোনীত বাক্তির উপর বর্তাইবে।

- **সামাজিক বনায়ন হইতে লব্ধ আয়ের বণ্টন**

বিধি ২০:
ছাঁটাইকৃত ডালপালা, প্রথম ঘনত্ব হ্রাসকরণকালে কর্তিত বৃক্ষ, ফলজ বৃক্ষের ফল এবং উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল সম্পূর্ণ উপকারভোগীগণ প্রাপ্য হইবেন। প্রথম ঘনত্ব হ্রাসকরণ এর পরবর্তী সকল ঘনত্ব হ্রাসকরণকালে এবং আবর্তকাল পূর্ণ হইবার পর কর্তিত বৃক্ষ হইতে লব্ধ আয় বিভিন্ন পক্ষগণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট হারে বণ্টিত হইবে।

- **বৃক্ষরোপণ তহবিল**

বিধি ২৩:
সামাজিক বনায়নের জন্য প্রত্যেক এলাকায় বৃক্ষরোপণ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে। যেখানে সামাজিক বনায়ন হইতে লব্ধ আয়ের নির্ধারিত অংশ জমা হইবে। প্রথম আবর্তকাল পরবর্তী সকল বৃক্ষরোপণ ও উহার পরিচর্যার ব্যয়ভার তহবিল হইতে দেওয়া হইবে। উল্লেখিত ব্যয় বহনের পর তহবিলে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে তা বন উন্নয়ন উপকারভোগীগণের নার্সারি বা বৃক্ষভিত্তিক কর্মকাণ্ড বা সামজিক উন্নয়মূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা যাইবে।

সামাজিক বনায়ন সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা চতুর্থ অধিবেশনে বলা হল।

৩.২.৩ *ব্যক্তিগত বন অধ্যাদেশ, ১৯৫৯*
পতিত জমিতে বনায়ন ও বাক্তিগত বন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মূলত এই অধ্যাদেশটি জারি করা হইয়াছে ।

- **ব্যক্তিগত বনের সংজ্ঞা**

ধারা ২(১৪):
ব্যক্তিগত বন হচ্ছে সেই বন যা সরকারের সম্পত্তি নয় এবং যার মালিকানাও সরকারের নয়।
উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ব্যক্তিগত বন অধ্যাদেশ ১৯৫৯-এ ব্যক্তিগত বনের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে দেশে কোন ব্যক্তিগত বন নেই। কেননা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী বন হিসেবে রেকর্ডকৃত সকল ভূমির মালিকানা সরকারের উপর ন্যস্ত [ধারা-২০(২এ)]।

- ***নিয়ন্ত্রিত বন***

ধারা ২(৪):
নিয়ন্ত্রিত বন বলতে ওই সব বাক্তিগত বনকে বোঝায় যা অর্পিত বন নয় এবং ধারা ৩ থেকে ৬৩ পর্যন্ত যার উপর সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রণয়ন যোগ্য ।

- **কর্মপরিকল্পনা**

ধারা ৩:
সরকার ব্যক্তিগত বন মালিকদের বন সংরক্ষণ ও রক্ষার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যা সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হতে হইবে। বন মালিকগণ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করিতে বাধ্য।

- **কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ না করার শাস্তি**

ধারা ৬:
কোন বন মালিক কর্মপরিকল্পনার শর্ত ভঙ্গ করলে প্রথম বার শাস্তি সরূপ জরিমানা দিতে বলা হতে পারে যা সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে । পুনরায় শর্ত ভঙ্গের শাস্তি সরূপ সরকার ব্যক্তিগত বন অধিগ্রহণ করে নিতে পারে।

- **অর্জিত বন/অর্পিত বন**

সাধারণত অর্জিত বন বলতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন বা জামিনদারদের নিকট হতে অধিগ্রহণের মাধ্যমে বা অন্য যেকোনভাবে অধিগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত কোন

বনকেই বুঝায়। এ ধরণের বন রিজার্ভ, প্রোটেক্টেড, নিয়ন্ত্রিত বা ন্যস্ড় বন নয় বরং প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত বন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

- **অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন**

অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন বলতে এমন শ্রেণির বনকে বোঝায় যা রিজার্ভ, প্রটেক্টেড, নিয়ন্ত্রিত বা ন্যস্ত বন হিসেবে প্রজ্ঞাপিত নয়।

৩.২.৪ *বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২*

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন অর্থাৎ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ১৯৭৩ রহিতপূর্বক দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে এবং ২০১১ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ ১৮ক-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১২ সালে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- **বন্যপ্রাণীর সংজ্ঞা**

ধারা ২(২৫):
"বন্যপ্রাণী" অর্থ বিভিন্ন প্রকার ও জাতের প্রাণী বা তাহাদের জীবনচক্র বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়সমূহ যাহাদের উৎস বন্য হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে।

"অভয়ারণ্য" এবং এ সংক্রান্ত বিধানসমূহ

- **অভয়ারণ্যের সংজ্ঞা**

ধারা ২(১):
অভয়ারণ্য অর্থ কোন এলাকা যেখানে বন্যপ্রাণী ধরা, মারা, গুলি ছোড়া বা ফাঁদ পাতা নিষিদ্ধ এবং মূখ্যত বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন-উদ্ভিদ, মাটি ও পানি সংরক্ষণের নিমিত্তে ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যাহা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর ধারা ১৩ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

- **অভয়ারণ্য ঘোষণা**

ধারা ১৩(১)
সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় বননীতি ও বন মহাপরিকল্পনার আলোকে এবং প্রকৃতি, ভূমিগঠনগত বৈশিষ্ট্য, জীববৈচিত্র্য বা পরিবেশগত গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কোন সরকারি বন, বনের অংশ, সরকারি ভূমি, জলাভূমি বা যে কোন নির্দিষ্ট এলাকাকে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণের নিমিত্ত সুনির্দিষ্টভাবে সীমানা নির্ধারণপূর্বক, অভয়ারণ্য ঘোষণা করিতে পারিবে।

ধারা ১৩ (২)
অভয়ারণ্যকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, পাখি অভয়ারণ্য, হাতি অভয়ারণ্য বা জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য, বা ক্ষেত্রমত, মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে।

ধারা ১৩ (৩)
কোন জলাভূমিকে অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হইলে উক্ত এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী, যেমন- জেলে, নৌকাচালক ইত্যাদি পেশাগত, প্রথাগত বা জীবন জীবিকার অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

- **অভয়ারণ্যে নিষিদ্ধ কার্যক্রম**

ধারা ১৪:

ধারা (১৪)(১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি অভয়ারণ্যে-

- চাষাবাদ করিতে পারিবেন না;
- কোন শিল্প কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না;
- কোন উদ্ভিদ আহরণ, ধ্বংস বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না;
- কোন প্রকার অগ্নিসংযোগ করিতে পারিবেন না;
- প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না;
- কোন বন্যপ্রাণীকে বিরক্ত করিতে বা ভয় দেখাইতে পারিবে না কিংবা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিনষ্ট হইতে পারে এইরূপ কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, গোলাবারুদ, বা অন্য কোন অস্ত্র বা দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না;
- বিদেশি (Exotic) প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রবেশ করাইতে পারিবেন না;
- কোন গৃহপালিত পশু প্রবেশ করাইতে বা কোন গৃহপালিত পশুকে নিরুদ্দিষ্ট রাখিতে পারিবেন না;
- বন্যপ্রাণীর জন্য ক্ষতিকর পদার্থ গাদি (ডাম্পিং) করিতে পারিবেন না;
- কোন খনিজ পদার্থ আহরণের জন্য অনুসন্ধান কিংবা গর্ত করিতে পারিবেন না;
- উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে সিলভিকালচারাল অপারেশন ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন উদ্ভিদ বা উহার অংশ কাটিতে পারিবেন না;
- জলপ্রবাহের গতি পরিবর্তন, বন্ধ বা দূষিত করিতে পারিবেন না; অথবা
- কোন এলিয়েন (Alien) ও আগ্রাসী (Invasive) প্রজাতির উদ্ভিদ প্রবেশ করাইতে পারিবেন না।
- কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি এই আইন প্রবর্তনের পর অভয়ারণ্যের সীমানার ২ (দুই) কিলোমিটারের মধ্যে কোন শিল্প কারখানা বা ইট ভাটা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

- **অভয়ারণ্যে প্রবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ:**

ধারা ১৫(১)

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ অভয়ারণ্যে প্রবেশ অথবা অবস্থান করিতে পারিবেন না, যথা:

- এই আইন বা বিধির অধীন দায়িত্ব পালনরত কোন কর্মকর্তা;
- প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;
- বন অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত সংরক্ষণ কাজের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি;
- অভয়ারণ্যের মধ্যে নির্মিত মহাসড়ক, সড়ক বা জলপথে চলাচলরত কোন ব্যক্তি; এবং
- অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনা বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আবশ্যক ব্যক্তি, যিনি প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত।

ধারা ১৫(২)

প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক ও ক্ষেত্রমতে, প্রবেশ ফি আদায় সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অভয়ারণ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন যথা: -

(ক) বন্যপ্রাণীর উপর প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক বিষয়ের উপর অধ্যয়ন বা অনুসন্ধান;
(খ) ছবি তোলা;

(গ) গবেষণা; ও
(ঘ) ইকোট্যুরিজম।

- **অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধঃ**

ধারা ১৬(১)
প্রতিটি অভয়ারণ্যের জন্য সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে ।

ধারা ১৬(২)
প্রধান ওয়ার্ডেন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে সীমিত আকারে অভয়ারণ্যের ভিতর-

- কোন বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য কোন পর্যটন দোকান, কটেজ বা হোটেল নির্মাণ ব্যতীত রাস্তা, সেতু, ভবন, বেষ্টনী বা প্রতিবন্ধক প্রবেশ তোরণ নির্মাণ ও সীমানা চিহ্নিতকরণ অথবা এই ধরণের অন্যান্য কাজ যাহা অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আবশ্যক তাহা করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন;
- বন্যপ্রাণী বা উহার আবাসস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;
- বন্যপ্রাণী রক্ষার স্বার্থে আবাসস্থল উন্নয়ন, প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষা, প্রজননের সময় উপদ্রব মুক্তরাখা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সীমিত আকারে বন্যপ্রাণী খাদ্য উপযোগী বাগান সৃজন করিতে পারিবেন;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, মাছ ধরা কার্যক্রম বা জলযান চলাচল নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে কচ্ছপ, কুমির, ডলফিন, তিমি, শুশুক ইত্যাদি মিঠা ও নোনা পানির জলজ প্রাণী রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন; অথবা
- অভয়ারণ্য এলাকার সীমানা হইতে ২ (দুই) কিলোমিটারের মধ্যে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করিয়া উহা নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

- **সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র ঘোষণাঃ**

“ইকোপার্ক” এর সংজ্ঞাঃ ২(৪)
“ইকোপার্ক” অর্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক (ecological) আবাসস্থল ও নয়নাভিরাম দৃশ্য সম্বলিত এলাকা যেখানে পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যাহা এই আইনের ধারা ১৯ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

- **সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র ঘোষণা :**

ধারা ১৯(১):
সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যপ্রাণীর স্বীয় আবাসস্থলে (in-situ) বা আবাসস্থলের বাহিরে অন্যত্র (ex-situ) সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা গবেষণা, জনসাধারণের চিত্তবিনোদন বা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির

লক্ষ্যে যে কোন সরকারি বনভূমিকে, সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান বা ক্ষেত্রমত, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

"কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা" এবং এ সংক্রান্ত বিধিনিষেধঃ

- **"কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা"এর সংজ্ঞা ধারা ২(৭)**

ধারা ২(৭)-এ বলা হইয়াছে "কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা" অর্থ কোন এলাকা যেখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন অথবা কমিউনিটি বা সরকারি খাস জমিতে উদ্ভিদ ও বণ্যপ্রাণী রক্ষা এবং প্রথাগত বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যাহা এই আইনের ধারা ১৮ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

- **কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা ঘোষণাঃ**

ধারা ১৮(১);

ল্যান্ডস্কেপ জোনের অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ কোন জমি বা জলাভূমির মালিক কোন ব্যক্তি বা কমিউনিটি কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ এর প্রথাগত অথবা কৃষ্টিগত মূল্যবোধ বা ব্যবহার সংরক্ষণ এবং উক্ত জমি বা জলাভূমির টেকসই উন্নয়ন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা হিসাবে ঘোষণার লক্ষ্যে সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

ধারা ১৮(২):

উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন করা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আবেদনে উল্লিখিত জমি বা জলাভূমিকে কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে ।

ধারা ১৮ (৩)

উপ-ধারা (২) এর অধীন ঘোষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করিতে পারিবে এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

ধারা ১৮ (৪)

উপ-ধারা (২) এর অধীন ঘোষিত এলাকার কোন ক্ষতিগ্রস্ত মালিককে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবে।

- **জাতীয় উদ্যান এবং এ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ**

"জাতীয় উদ্যান" এর সংজ্ঞা

ধারা ২(১৪):

"জাতীয় উদ্যান" অর্থ মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর এলাকা যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য জনসাধারণকে শিক্ষা, গবেষণা ও বিনোদনের অনুমতি প্রদান এবং উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যাহা এই আইনের ধারা ১৭ এর অধীন সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত কোন এলাকা;

- **জাতীয় উদ্যান ঘোষণাঃ**

ধারা ১৭(১)

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন সরকারি বন, বনের অংশ বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত সরকারি ভূমিকে, বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের উন্নয়ন অথবা পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে সীমানা নির্ধারণপূর্বক, জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

জাতীয় উদ্যান ঘোষণার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুসরণ বা ক্ষেত্রমতে, বিবেচনা করিতে হইবে, যথাঃ

- বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জাতীয় নীতিমালা বা মহা-পরিকল্পনা;
- ভূমির গঠনগত বৈশিষ্ট্য; গুরুত্ব ;
- ইকোলজি;
- পরিবেশ।

- **"বাফার জোন" এর সংজ্ঞা**

ধারা ২(২৭):

ধারা ২(২৭)-এ বলা হইয়াছে "বাফার জোন" অর্থ কোর জোন ব্যতীত রক্ষিত এলাকার প্রান্ত সীমানায় অবস্থিত বনভূমি অথবা লোকালয়ের পার্শ্বে অবক্ষয়িত বন এলাকা, যেখানে স্থানীয় জনসাধারণের বনজদ্রব্য আহরণের প্রবণতা আছে এবং যেখানে রক্ষিত এলাকার উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্বল্প মেয়াদি অংশীদায়িত্ব বনায়নের সুযোগ আছে ও উহার উন্নয়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হইবে এবং যাহা এই আইনের ধারা ২০ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

- **ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর, বাফার জোন ও কোর জোন ঘোষণাঃ**

ধারা ২০ (১):

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের মতামত গ্রহণপূর্বক ঘোষিত যে কোন এলাকা, রক্ষিত বা সংরক্ষিত বন এলাকার সীমানার বাহিরে কিন্তু উহার সংলগ্ন যে কোন সরকারি বা বেসরকারি এলাকাকে বন্যপ্রাণী চলাচলের উপযোগী বা বিশেষ উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজনে বা উক্ত এলাকার যে কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোর হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

ধারা ২০(২):

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রক্ষিত এলাকা বা কোর জোন এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, বনজদ্রব্য আহরণের উপর চাপ হ্রাস ও রক্ষিত বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য কোর জোন ব্যতীত রক্ষিত বনের অভ্যন্তরে বা প্রান্ত সীমানায় অবস্থিত অবক্ষয়িত বন এলাকাকে বাফার জোন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

ধারা ২০(৩):

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের জন্য জনসাধারণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ বা বনজদ্রব্য আহরণ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকার কেন্দ্রস্থলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বন বা দীর্ঘমেয়াদি বনকে, কোর জোন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

- **বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা:**

ধারা ২২

সরকার স্বীয় উদ্যোগে কিংবা কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন সরকারি ভূমি, ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি বা বৃক্ষরাজি অথবা সংরক্ষিত বন, খাস জমি, জলাভূমি, নদী, সমুদ্র, খাল, দিঘি বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পুকুরকে উক্ত এলাকার প্রথাগত বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং অনুশাসন সংরক্ষণ সাপেক্ষে বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

- **জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ এবং কুঞ্জবন ঘোষণাঃ**

ধারা ২৩

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি বন, কোন সংস্থার অধীন ভূমি, খাস জমি বা কমিউনিটির মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষ বা কুঞ্জবন যাহা সাংস্কৃতিক, প্রথাগত, ধর্মীয় বা স্মৃতিস্মারক হিসাবে চিহ্নিত ও ব্যবহৃত এবং যাহা বিভিন্ন ধরণের বন্য প্রাণীর আবাসস্থল হিসাবে উক্ত এলাকায় পরিচিত তাহা উক্ত ভূমির মালিক, সংস্থা বা ব্যক্তির আবেদনক্রমে, জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ, বা ক্ষেত্রমত, কুঞ্জবন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, কমিউনিটি বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহাদের প্রথাগত বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং অনুশাসন সংরক্ষণ করিতে হইবে।

- **সহ-ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা**

ধারা ২(৩৮)

ধারা ২(৩৮)-এ বলা হইয়াছে "সহ-ব্যবস্থাপনা" অর্থ কোন একটি এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বুঝায়।

- **সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিঃ**

ধারা ২১ (১)

সরকার অভয়ারণ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তর, বনাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনসাধারণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করিতে পারিবে ।

ধারা ২১ (২)

উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিতে এবং উক্ত কমিটির কার্যপরিধিও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

যদিও এই ধারা প্রবর্তিত হবার পূর্বেই সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০০৯ সালে প্রণয়ন করেন।

- **শিকার এর সংজ্ঞাঃ**

ধারা ২(৩৭)

"শিকার" অর্থ-

(ক) কোন বন্যপ্রাণীকে হত্যা করা, ধরা, বিষ প্রয়োগ করা বা অনুরূপ কোন উদ্যোগ; অথবা

(খ) উপ-দফা (ক) এ বর্ণিত কোন উদ্দেশ্যে বন্যপ্রাণীকে তাড়াইয়া নেওয়া; অথবা

(গ) কোন বন্যপ্রাণীকে আহত বা ক্ষতি করা এবং কোন বন্যপ্রাণীর কোন অংশ নেওয়া বা বন্য পাখির বা সরীসৃপের বাসা বা ডিম সংগ্রহ বা ধ্বংস করা।

- **বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা :**

ধারা ৬(১):

লাইসেন্স বা ক্ষেত্রমত, পারমিট গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী শিকার বা এ আইনের তফসিলে বর্ণিত উল্লিখিত কোন উদ্ভিদ ইচ্ছাকৃতভাবে উঠানো, উপড়ানো, ধ্বংস বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না ।

ধারা ৬(২):

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট বা সকল বন্যপ্রাণী কোন নির্দিষ্ট বন বা এলাকা বা সমগ্র দেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিকার নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

ধারা ৩৯: শাস্তি

কোন ব্যক্তি ধারা ৬(১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

- **বন্যপ্রাণী অপসারণ, ইত্যাদি: ধারা ৮**

অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কোন কিছু উল্লেখ না থাকিলে, কোন বন্যপ্রাণী -

- মানুষের জীবন ও সম্পদের (গৃহপালিত পশু ও ফসলের) প্রতি হুমকির কারণ হইলে; অথবা
- দৈহিকভাবে পঙ্গু বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হইলে; অথবা
- কোন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রতি হুমকির কারণ হইলে-

  প্রধান ওয়ার্ডেন বা অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন বা ওয়ার্ডেন কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত বন্যপ্রাণী অপসারণ, হত্যা বা ক্ষেত্রমত, পুনর্বাসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি উপদেষ্টা বোর্ড ও বৈজ্ঞানিক কমিটিতে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করিবেন।

- **নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের শাস্তি:**

ধারা ৩৫

কোন ব্যক্তি ধারা ১৪ এ উল্লিখিত কোন নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন ও উক্তরূপ অপরাধের জন্য জামিন অযোগ্য হইবেন এবং তিনি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৪ (চার) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

- **বাঘ ও হাতি হত্যার দণ্ড:**

ধারা ৩৬(১)

কোন ব্যক্তি ধারা ২৪ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া তফসিল ১ এ উল্লিখিত কোন বাঘ বা হাতি হত্যা করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন ও উক্তরূপ অপরাধের জন্য জামিন অযোগ্য হইবেন এবং তিনি সর্বনিম্ন ২ (দুই) বৎসর এবং সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ১ (এক) লক্ষ এবং সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের

পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, বাঘ বা হাতি কর্তৃক কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হইলে এবং উহার ফলে তাহার জীবনাশঙ্কার সৃষ্টি হইলে জীবন রক্ষার্থে উক্ত আক্রমণকারী বাঘ বা হাতিকে হত্যার ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন মামলা দায়েরের প্রশ্ন দেখা দিলে, সংশ্লিষ্ট স্টেশন কর্মকর্তা ওয়ার্ডেন এর সহিত পরামর্শক্রমে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

ধারা ৩৬(২)

কোন ব্যক্তি ধারা ১০ এর অধীন পারমিট গ্রহণ না করিয়া তফসিল ১ এ উল্লেখিত কোন বাঘ বা হাতির ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ সংগ্রহ করিলে, দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় করিলে বা পরিবহন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

- **অপরাধের আমলযোগ্যতা, আমল অযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা, জামিন অযোগ্যতা :**

ধারা ৪৩

ধারা ৩৬ এর অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য হইবে।

- **চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন হত্যার দণ্ডঃ**

ধারা ৩৭ (১)

কোন ব্যক্তি তফসিল ১ এ উল্লিখিত কোন চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন হত্যা করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন

তবে শর্ত থাকে যে, চিতা বাঘ বা কুমির কর্তৃক কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হইলে এবং উহার ফলে তাহার জীবনাশঙ্কার সৃষ্টি হইলে জীবন রক্ষার্থে উক্ত আক্রমণকারী চিতা বাঘ বা কুমিরকে হত্যার ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না:

ধারা ৩৭(২)

কোন ব্যক্তি কোন চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন এর ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি মাংস দেহের অংশ সংগ্রহ করিলে, দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় করিলে বা পরিবহন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন

এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৪ (চার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

- **পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যার দণ্ডঃ**

ধারা ৩৮(১)

কোন ব্যক্তি তফসিল ১ ও ২ এ উল্লিখিত কোন পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যা করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ৩৮(২):

কোন ব্যক্তি তফসিল ১ ও ২ এ উল্লিখিত কোন পাখি বা পরিযায়ী পাখির ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস দেহের অংশ সংগ্রহ করিলে, দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় করিলে বা পরিবহন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

৩.২.৫ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (প্রজ্ঞাপন নং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮)

২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে রক্ষিত এলাকা ও আশেপাশের মূল স্টেকহোল্ডারদের (Stakeholders) পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার্থে নিম্নোক্ত ভাবে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে এবং এ কাউন্সিল ও কমিটির কার্যক্রম প্রদান করা হইয়াছে-

- **সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council)**

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সর্বোচ্চ ৬৫ জন সদস্য থাকিবে। তার মধ্যে ন্যূনতম ১৫ জন মহিলা সদস্য থাকিবেন। এ কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে থাকিবেন মাননীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যন, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা। এ কমিটির সদস্য হিসেবে থাকিবেন সুশীল সমাজ (স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা); স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও সরকার; স্থানীয় জনগোষ্ঠী; অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রক্ষিত এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল চার বছরের জন্য নির্বাচিত হইবে। প্রতি চার বছরে নির্বাচনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কাউন্সিল গঠিত হইবে। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকিবেন।

- **সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (Co-management Council) কার্যপরিধি :**

- স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহন এবং কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা।
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা।
- রক্ষিত ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা।
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা।
- রক্ষিত এলাকা হতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীদারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নীতি নির্ধারণ ও পরামর্শ প্রদান করা।
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কিংবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন দ্বন্দ্ব বা বিবাদ দেখা দিলে তা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।
- সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করা।
- বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠান করা।

- **সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co-management Committee):**

কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৯ জন হইবে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত করিবেন। এ কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে থাকিবেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (পদাধিকারবলে), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ, এন, ও) (পদাধিকারবলে) । এ কমিটির সদস্য হিসেবে থাকিবেন সহকারী বন সংরক্ষক, সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, পিপলস ফোরামের প্রতিনিধি, বন সংরক্ষন ক্লাবের প্রতিনিধি,বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিনিধি, পেট্রোলিং গ্রুপের প্রতিনিধি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ, বি.ডি.আর, কোস্ট গার্ড), সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার/স্টেশন অফিসার।

সদস্যদের মধ্যে ন্যূনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকিবে। পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্যগণ ছাড়া সকল সদস্যই ২ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন। কমিটির সদস্যগণ মাসে ন্যূনতম ১ (এক) বার সভায় মিলিত হইবেন। সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিতি সভার কোরাম হিসাবে গণ্য করা হইবে।

- **সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম :**

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মুখ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ

- রক্ষিত এলাকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা।
- রক্ষিত এলাকার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পরিকল্পিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল Mobilization এর ব্যবস্থা করা।
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা।
- রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় (Landscape) বন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনায় পিপলস ফোরামের সহোযোগিতায় রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা।
- রক্ষিত এলাকায় বন বিভাগ সহ স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষন ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিতদের মধ্যে পণ্য, সেবা ও সুফল যৌক্তিকভাবে বণ্টন এবং টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

- সরকার অনুমোদিত নির্দেশিকা মতে এন্ট্রি ফি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষনে যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করা।
- বাফার জোনে (Buffer Zone) বাগান সৃজন ও সৃজিত বনের সুফল অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি ও পদ্ধতি মতে বণ্টন, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি ।

এ কমিটি সকল কার্যক্রমের জন্য পিপলস ফোরাম এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকিবে।

৩.২.৬ বন নীতি, ১৯৯৪

বন নীতি, ১৯৯৪ বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারণে দেশের বন সম্পদের অস্বাভাবিক ও দ্রুত অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে পরিবেশের অবনতিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও অনাকাঙ্খিত প্রতিকূলতা মোকাবিলার লক্ষ্যে বন নীতি ১৯৭৯ সংশোধনপূর্বক ইহাকে যুগপোযোগী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে বন নীতি, ১৯৭৯ সংশোধনপূর্বক 'জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪' প্রণয়ন করা হইয়াছে। এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ইচ্ছা করিয়াছেন:

১. বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ
২. জাতীয় বন নীতির উদ্দেশ্যসমূহ
৩. জাতীয় বন নীতির ঘোষণাসমূহ

- **বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ:**

বনখাতের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পূর্ব শর্তসমূহ হচ্ছে-
- বনখাত হইতে এমন বেশ কিছু পণ্য সামগ্রী ও সেবা পাওয়া যায় যাহা জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অত্যাবশ্যক। বাড়িঘর, নৌকা ইত্যাদি তৈরির জন্য কাঠ, রান্নাবান্নার কাজের জন্য জ্বালানিকাঠ, গবাদি পশুর খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য ঔষধ জাতীয় লতাপাতা, গুল্ম ও ফলমুল এবং মৃত্তিকা আবরণী, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সেবা সহযোগিতা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হইবে (বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্ত -১)।
- বনখাতের উন্নয়নের সুফলসমূহ জনগণের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করিতে হইবে এবং বিশেষ করিয়া যাহাদের জীবন-জীবিকা বৃক্ষ বন ও বনভূমির উপর নির্ভরশীল, তাহাদেরকে এ খাতের উপকার ও সুফল প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে (বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্ত-২) ।

- বন খাতের উন্নয়নে বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মহিলাসহ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৃক্ষচাষি বন ব্যবহারকারী এবং যাহাদের জীবিকা বন ও বনভূমির উপর নির্ভরশীল তাহাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে (বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্ত-৩) ।

- বনজ এবং বৃক্ষ সম্পদের সুষ্ঠু ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা উল্লেখিত সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতাকে সংরক্ষণ পূর্বক ইহার সদ্ব্যবহার এবং জৈব পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে, যাহাতে এই সম্পদ গ্রামীণ ও জাতীয় উন্নয়নে ফলপ্রসু অবদান রাখিতে পারে (বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্ত-৫) ।

- **জাতীয় বন নীতির উদ্দেশ্যসমূহ :**

বন নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে-

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগণের মৌলিক চাহিদা সমূহ পূরণের জন্য এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে বৃক্ষ ও বনের সার্বিক ভূমিকা আরও কার্যকরীভাবে সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বন ও বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমি এলাকার আয়তন বিশ ভাগে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন খালি জায়গা, কৃষি ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত পতিত ও প্রান্তিক ভূমি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বনহীন এলাকায় সরকারি বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে বনায়ন কার্যক্রমকেও উৎসাহিত করাসহ বনজ ফসল উৎপাদন সংশিষ্ট সেবাসমূহের অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে (জাতীয় বন নীতির উদ্দেশ্য -১)

- **জাতীয় বন নীতির ঘোষণাসমূহ:**

বন নীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাসমূহের মধ্যে রয়েছে-

- দেশের সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ অত্যন্তসীমিত বিধায় সংরক্ষিত বনভূমির বাহিরে গ্রামীণ এলাকায়, উপকূলবর্তী অঞ্চলে জাগিয়া উঠা নতুন চরভূমিতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণিভুক্ত বৃক্ষহীন বনাঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে {জাতীয় বন নীতির ঘোষণা (২)}।

- সরকারি মালিকানাধীন প্রান্তিক ভূমি যথাসড়ক, রেলপথ ও সকল প্রকারের বাঁধের উভয়পার্শ্বে সরকারি উদ্যোগে এবং স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ও বেসরকারি সংস্থার অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হইবে {জাতীয় বন নীতির ঘোষণা (৫)}।

- মাটি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও উন্নয়নের নিমিত্তে সরকারি মালিকানাধীন, সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনের অন্তর্গত দেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য জেলাসমূহ নদীর উৎস্য-মুখ এবং প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুলের প্রতিনিধিত্বকারী অঞ্চলসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অভয়ারণ্য জাতীয় পার্ক এবং প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিয়া সুরক্ষিত করা হইবে। ২০১৫ সালের মধ্যে এইরূপ সুরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ সংরক্ষিত বনভূমির শতকরা ১০ ভাগে উন্নীত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে {জাতীয় বন নীতির ঘোষণা (৮)}।

- সংকটপূর্ণ এলাকা যথা- পাহাড়ের খাড়া ঢাল, নাজুক জলবিভাজিকা, জলাভূমি ইত্যাদি বনাঞ্চলকে চিহ্নিত করিয়া রক্ষিত বন (প্রটেকটেড ফরেষ্ট) হিসাবে সংরক্ষণ করা হইবে {জাতীয় বন নীতির ঘোষণা (১১)}।

- জাতীয় বন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে বন বিভাগকে শক্তিশালী করা হইবে এবং সামাজিক বনায়ন অধিদপ্তর নামে একটি নতুন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হইবে {জাতীয় বন নীতির ঘোষণা (২৭)}।

৩.৩ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বন আইন, ১৯২৭ এবং-এর অধীন প্রণীত সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বন বিভাগ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। যদিও বন আইনের কোন ধারায় বন বিভাগের দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়নি বরং বিভিন্ন ধারাতে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। যেমন-

- **ফরেস্ট অফিসার:**

ধারা ৭৩

ফরেস্ট অফিসারকে দণ্ডবিধি অনুসারে একজন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা হইয়াছে।

- **বনের কাঠ, অন্যান্য সামগ্রীর জব্দ করার ক্ষমতা:**

ধারা ৫৫

ফরেস্ট অফিসার সব ধরনের কাঠ, বন হতে উৎপন্ন অন্যান্য সামগ্রী যার মালিক সরকার নয় এবং যা সংগ্রহ করা এই আইনের অধিনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় এমন সব কিছুই জব্দ করিতে পারিবেন । এছাড়া অপরাধটি সংগঠিত হবার সময় ব্যবহৃত কাঠ, নৌকা , যানসহ অন্য সরঞ্জামও জব্দ করা হইবে।

- **বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতারের ক্ষমতা:**

ধারা ৬৪(১):

ফরেস্ট অফিসার বা পুলিশ অফিসার বিনা ওয়ারেন্টে একজন বাক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারেন যদি ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিসম্মত সন্দেহের সৃষ্টি হয়, যে তিনি এমন অপরাধ সংগঠিত করেছেন যার শাস্তি সরূপ একমাস বা তদূর্ধ্ব শাস্তি প্রদান করা যায় ।

ধারা ৬৪(২):

প্রত্যেক অফিসার এই ধারার অধীনে গ্রেফতারের পর বিনা বিলম্বে গ্রেফতারকৃত বাক্তিকে বন্ডে সই করিয়ে মুক্তি দিবেন অথবা এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে চালান করিবেন অথবা নিকটস্থ থানায় সোপর্দ করিবেন।

- **অপরাধ দমনের ক্ষমতা**

ধারা ৬৬:

প্রত্যেক ফরেস্ট অফিসার আর অপরাধ দমন এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা আছে।

- **বন অপরাধের মামলার বাদীপক্ষ:**

ধারা ৬৯ক

সরকার ডেপুটি রেঞ্জার বা তদূর্ধ্ব যে কোন ফরেস্ট অফিসার কে মামলা দায়ের ও বাদীপক্ষ হিসেবে মামলা পরিচালনার ক্ষমতা দিতে পারেন ।

- **ধারা ৫৫, ৫৬ এবং ৫৭ এর আদেশ আর বিরুদ্ধে আপিল:**

ধারা ৫৯

ফরেস্ট অফিসার ধারা ৫৫, ৫৬ এবং ৫৭ অধিনে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে, আদেশ প্রদানের একমাসের মধ্যে আপিল করিতে পারিবেন ।

সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ সামাজিক বনায়নে বন বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করেছে

- **সামাজিক বনায়নে বন বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

বিধি ১৬

১। উপকার ভোগী নির্বাচন;

২। বৃক্ষরোপণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

৩। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উপকারভোগীকে সহায়তা প্রদান এবং কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;
৪। চুক্তি সম্পাদন;
৫। ফসল আহরণ ও প্রাপকগণের নিকট বণ্টন;
৬। উপকার ভোগীকে বীজ ও চারা সংগ্রহে সহায়তা; এবং
৭। চুক্তি মোতাবেক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে উপকার ভোগীদের সহিত চুক্তি বাতিল ইত্যাদি।

সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ অধীনে সামাজিক বনায়ন কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে । কমিটির গঠন ও দায়িত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল-

- **সামাজিক বনায়ন বাবস্থাপনা কমিটি:**

বিধি ৯ সামাজিক বনায়ন বাবস্থাপনা কমিটি **১** জন সভাপতি, সহ- সভাপতি , সাধারন সম্পাদক , সহ- সাধারন সম্পাদক, ট্রেজারার ও ৪ জন সাধারন সদস্য নিয়ে গঠিত হইবে।

- **মেয়াদ:**

বিধি ১০

এই কমিটির সদস্য গণের মেয়াদ ২ বছর হইবে এবং তারা পুনরায় নির্বাচিত হবার সুযোগ পাইবেন।

- **দায়িত্ব:**

বিধি ১১

সামাজিক বনায়ন বাবস্থাপনা কমিটি মূলত -
১। সামাজিক বনায়নে বন কর্মকর্তাকে সহায়তা করিবেন;
২। বনের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন;
৩। উপকার ভোগীকে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করিবেন এবং বিধিমালার অধিনে সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা করিবেন;
৪। বৃক্ষরোপণ তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করিবেন;
৫। চুক্তিভুক্ত পক্ষের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন; এবং
৬। বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করিবেন।

- **উপদেষ্টা কমিটি:**

বিধি ১৪

উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইবে-
১। বন অধিদপ্তরে স্থানীয় প্রধান কর্মকর্তা;
২। বিধি ৮ এর অধিনে নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি;
৩। সামাজিক বনায়ন বাবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত **১** জন বিশিষ্ট সমাজসেবক যিনি বাবস্থাপনা কমিটির সদস্য নয়।

উপদেষ্টা কমিটি মূলত সামাজিক বনায়ন বাবস্থাপনা কমিটিকে এবং উপ- সামাজিক বনায়ন বাবস্থাপনা কমিটিকে পরামর্শ দিবেন । এছাড়া বাবস্থাপনা কমিটি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনে অসমর্থ হলে উপদেষ্টা কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন।
বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বাস্তবায়নকারী সংস্থাও বন বিভাগ। এ আইনের ধারা ৩ এবং ৫-এ আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিম্নরূপ দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে-

৩.৩.১ বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২

- **বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড গঠন**

ধারা ৩(১):

এ ধারায় বলা হইয়াছে এই আইন প্রবর্তনের পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন চেয়ারম্যান এবং জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।

ধারা ৩(২):

ধারা ৩(২) -এ বলা হইয়াছে উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা: -

(ক) জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণী ও বন সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

(খ) জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণী ও বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

(গ) জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণী ও বন সংরক্ষণ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপদেশ প্রদান করা;

(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কারিগরি কমিটি, উপ-কমিটি বা অন্য যে কোন কমিটি গঠনের বিষয়ে প্রধান ওয়ার্ডেন কর্তৃক সরকারের নিকট উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুমোদন করা;

(ঙ) প্রধান ওয়ার্ডেন কর্তৃক সরকারের নিকট উপস্থাপিত বাৎসরিক প্রতিবেদন সুপারিশসহ অনুমোদন করা;

(চ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত এতদ সম্পর্কিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

- **দায়িত্ব অর্পণ:**

ধারা ৫(১):

এ ধারায় বলা হইয়াছে দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, নিরাপত্তার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে, যথা: -

(ক) প্রধান ওয়ার্ডেন;

(খ) অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন;

(গ) ওয়ার্ডেন।

ধারা ৫(২)

বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বন সংরক্ষক এবং বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণ পদাধিকারবলে যথাক্রমে প্রধান ওয়ার্ডেন, অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন এবং ওয়ার্ডেন হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

ধারা ৫(৩)

প্রধান ওয়ার্ডেন, অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন এবং ওয়ার্ডেন এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং ক্ষেত্রমত, সরকার বা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তাহারা দায়িত্ব পালন করিবেন।

- **সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি**

২০০৯ সালে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা ও আশেপাশের মূল স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার্থে নিম্নোক্ত ভাবে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে এবং এ কাউন্সিল ও কমিটির কার্যক্রম প্রদান করা হইয়াছে মূলত সুশীল সমাজ; স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও সরকার; স্থানীয় জনগোষ্ঠী; অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল চার বছরের জন্য নির্বাচিত হইবে। সহ -ব্যবস্থাপনা কমিটি পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্যগণ ছাড়া সকল সদস্যই ২ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

- **বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্রঃ**

ধারা ৩০

সরকার কোন আহত, জব্দকৃত, বাজেয়াপ্ত, পরিত্যক্ত অথবা দানকৃত বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা সেবা, খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্ত উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে এবং উদ্ধার কেন্দ্র হইতে বন্যপ্রাণী প্রকৃতিতে অবমুক্ত করার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

- **বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠনঃ**

ধারা ৩১

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তি ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার জন্য বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিমান বন্দর, স্থল বন্দর বা সমুদ্র বন্দরসহ বাংলাদেশের যে কোন স্থানে শুল্ক কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সমন্বয়ে বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করিতে পারিবে।

৩.৪ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য এবং বিচারিক ব্যবস্থা

৩.৪.১ বন আইন ১৯২৭

- **জামিন অযোগ্যতা :**

ধারা ৬৩ক

ধারা ২৬(১ক), ৩৩(১ক), ৬৩ এর অধীনে সংগঠিত অপরাধ অজামিনযোগ্য হইবে।

- **অপরাধের বিচারঃ**

ধারা ৬৭

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড বা অনধিক দশ হাজার টাকা পরিমাণ অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড শাস্তিযোগ্য কোন বন অপরাধ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর অধীন সংক্ষিপ্তভাবে বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।

- **ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগঃ**

ধারা ৬৭ক

সরকারি গেজেট দ্বারা, এই আইনের অধীন অপরাধ বিচার করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণের

এখতিয়ারধীন এলাকা নির্দিষ্ট করে দিতে পারিবে। এ ম্যাজিস্ট্রেটগণের আইনের অধীন যে কোন ধরনের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৩.৪.২ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২

- **আপোষযোগ্যতা:**

ধারা ৪৩

ধারা ৩৬ এর অধীন সংঘটিত অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য ধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধ আমল অ-যোগ্য, জামিনযোগ্য ও ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে আপোষযোগ্য।

- **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার:**

ধারা ৪৪ (১)

এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অথবা ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

ধারা ৪৪(২)

সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচার প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমতে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

তবে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ক্ষেত্রমতে, Code of Criminal Procedure, 1898 section 12 এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বা স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ বিচার্য হইবে। এ আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

এই অধিবেশনে প্রদত্ত বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি এবং বিচারিক ব্যবস্থা নিম্নের টেবিলে তুলে ধরা হলো-

আইন	ধারা	অপরাধ	শাস্তি	আদালত
বন আইন ১৯২৭	২৬	সংরক্ষিত বনে নিম্নলিখিত যে কোন কার্যক্রম করা- - বনে অগ্নিসংযোগ। - অনধিকার প্রবেশ করে গবাদি পশু চরাণো। - বন থেকে কাঠ অপসারণ করা। - বৃক্ষের বাকল তোলা বা বাকল চেঁছে রস সংগ্রহ করা, আইন বহির্ভূত ভাবে কাঠ সংগ্রহ করা - বৃক্ষ কিংবা কাঠ কাটার সময় অবহেলা বশত বনের ক্ষতি সাধন করা। - পাথর উত্তোলন, কাঠ, কয়লা পোড়ানো বা কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য কাঠ ছাড়া অন্য কোন বনজদ্রব্য সংগ্রহ করা বা সরানো। - চাষাবাদ বা অন্য কোন উদ্দেশে বন উজাড় করা - অনুমোদন ছাড়া শিকার করা, গুলি করা, মাছ মারা, পানি বিষাক্ত করা, ফাঁদ পাতা ।	নিম্নে ছয়মাস ও উর্ধ্বে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং নিম্নে পাঁচ হাজার টাকা ও উর্ধ্বে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে।	প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট।
বন আইন ১৯২৭	৩২	রক্ষিত বনে সরকার বিধি দ্বারা নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে:- - গাছ বা কাঠ কাটা, সংগ্রহ ইত্যাদি; - বনজদ্রব্য সরানো; - বন সংলগ্ন শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের গাছ, কাঠ বা অন্যান্য বনজদ্রব্য সংগ্রহের স্বার্থে লাইসেন্স প্রদান; - বাণিজ্যিক স্বার্থে গাছ কাটা বা সরানো বা অন্যান্য বনজদ্রব্য সংগ্রহের লাইসেন্স প্রদান এবং এসকল লাইসেন্স প্রাপ্তদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ; - বনজদ্রব্য সরানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ; - ঘাঁস কাটা বা গোচারণ নিয়ন্ত্রণ; - চাষাবাদের স্বার্থে বনভূমির ব্যবহার; - বন ও কাঠকে আগুন থেকে রক্ষা; - শিকার, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা এবং ফাঁদ পাতা। উপরোল্লিখিত কোন নির্দেশ লঙ্ঘন করা।	ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা প্রদানেও দায়ী হইবেন।	প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট।

আইন	ধারা	অপরাধ	শাস্তি	আদালত
বন আইন ১৯২৭	৩৩	কোন ব্যক্তি নিম্নের যে কোন একটি অপরাধ করেন- - ধারা ৩০ এর অধীন নিষেধ লঙ্ঘন করে পাথর উত্তোলন, অথবা চুন বা কাঠ কয়লা পোড়ায় বা কাঠ ব্যতীত অন্য কোন বনজদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সাপেক্ষে সংগ্রহ বা অপসারণ করে; - প্রজ্বলিত কোন অগ্নি, রক্ষিত বনের নিকট রেখে যায়; - কোন বৃক্ষ পাতিত করিতে বা কাঠ কর্তন করিতে বা টানতে অবহেলা বশত কোন ক্ষতি করে বা কোন ভূমি অন্য কোনভাবে চাষ করে বা চাষ করবার উদ্যোগ গ্রহণ করে; - গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশ করান বা চরান, বা গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন; - সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে আগ্নেয়াস্ত্রসহ কোন রক্ষিত বনে প্রবেশ করে; - সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত বা ক্ষতি বা অপরাধ হিসেবে গণ্য কোন অপরাধ করে।	ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা প্রদানেও দায়ী হইবেন।	প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট।
বন আইন ১৯২৭	৩৩	আবার কোন ব্যক্তি যদি নিম্নের যে কোন একটি অপরাধ করে যথা: - যদি কোন রক্ষিত বনে অগ্নি সংযোগ করে; বা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে বা বন বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ কোন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রেখে যায়; - সংরক্ষিত কোন বৃক্ষ পাতিত করে, রিং আকারে বাকল তোলে, ডালপালা কাটে, বাকল চেঁছে রস সংগ্রহ করে বা বাকল তোলে বা পাতা ছিঁড়ে বা অন্য কোন প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতি সাধন করে; - চাষের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণে রক্ষিত বনে কোন ভূমি পরিষ্কার করে বা ভাঙ্গে; - বিধি লঙ্ঘন করে শিকার করেন, গুলি ছোঁড়েন, ফাঁস বা ফাঁদ পাতেন বা বন্যপ্রাণী এবং পাখি, বা মাছ ধরে বা বধ করে বা পানি বিষাক্ত করে; - আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতীত রক্ষিত বনে কাঠ চিরানোর জন্য কোন গর্ত করে বা করাতের আসন তৈরি করে বা বৃক্ষকে কাঠে রূপান্তরিত	অন্যূন ছয় মাস এবং অনধিক পাঁচ বছর মেয়াদে কারাদণ্ড এবং অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।	প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট।

আইন	ধারা	অপরাধ	শাস্তি	আদালত
		করে; - রক্ষিত বন হতে কোন কাঠ অপসারণ করে;		
বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	১৪	কোন ব্যক্তি অভয়ারণ্যে- - চাষাবাদ করিতে পারিবেন না; - কোন শিল্প কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না; - কোন উদ্ভিদ আহরণ, ধ্বংস বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না; - কোন প্রকার অগ্নিসংযোগ করিতে পারিবেন না; - প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না; - কোন বন্যপ্রাণীকে বিরক্ত করিতে বা ভয় দেখাইতে পারিবেনা কিংবা বন্যপ্রাণীর আবাস্থল বিনষ্ট হইতে পারে এইরূপ কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, গোলাবারুদ, বা অন্য কোন অস্ত্র বা দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না; - বিদেশি (Exotic) প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রবেশ করাইতে পারিবেন না; কোন গৃহপালিত পশু প্রবেশ করাইতে বা কোন গৃহপালিত পশুকে নিরুদ্দিষ্ট রাখিতে পারিবেন না; - বন্যপ্রাণীর জন্য ক্ষতিকর পদার্থ গাদি (ডাম্পিং) করিতে পারিবেন না; -কোন খনিজ পদার্থ আহরণের জন্য অনুসন্ধান কিংবা গর্ত করিতে পারিবেন না; - উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে সিলভিকালচারাল অপারেশন ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন উদ্ভিদ বা উহার অংশ কাটিতে পারিবেন না; - জলপ্রবাহের গতি পরিবর্তন, বন্ধ বা দূষিত	সর্বোচ্চ দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন । (ধারা ৩৫)	প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমতে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

আইন	ধারা	অপরাধ	শাস্তি	আদালত
		করিতে পারিবেন না; অথবা - কোন এলিয়েন (Alien) ও আগ্রাসী (Invasive) প্রজাতির উদ্ভিদ প্রবেশ করাইতে পারিবেন না। - কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি এই আইন প্রবর্তনের পর অভয়ারণ্যের সীমানার ২ (দুই) কিলোমিটারের মধ্যে কোন শিল্প কারখানা বা ইট ভাটা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না। উপরোল্লিখিত কোন নির্দেশ লঙ্ঘন করা।		
বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	৩৬(১)	ধারা ২৪ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া কোন বাঘ বা হাতি হত্যা করিলে।	সর্বনিম্ন দুই বৎসর এবং সর্বোচ্চ সাত বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন এক লক্ষ এবং সর্বোচ্চ দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ বার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ পনের লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমতে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।
বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	৩৬(২)	ধারা ১০ এর অধীন পারমিট গ্রহণ না করিয়া কোন বাঘ বা হাতির ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ সংগ্রহ করিলে, দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় করিলে বা পরিবহন করিলে।	সর্বোচ্চ তিন বৎসর পর্যন্ত করাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমতে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।
বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	৩৭ (১)	চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন হত্যা করিলে।	সর্বোচ্চ তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমতে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।
বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন,	৩৭(২)	চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন এর ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি মাংস দেহের অংশ সংগ্রহ করিলে, দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় করিলে বা পরিবহন করিলে।	সর্বোচ্চ দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা	প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমতে, মেট্রোপলিটন

আইন	ধারা	অপরাধ	শাস্তি	আদালত
২০১২			সর্বোচ্চ ২ দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।
বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	৩৮(১)	পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যা করিলে।	সর্বোচ্চ এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমতে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।
বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	৩৮(২)	পাখি বা পরিযায়ী পাখির ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস দেহের অংশ সংগ্রহ করিলে, দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় করিলে বা পরিবহন করিলে।	সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।	প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমতে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।
বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	৩৯	ধারা ৬ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে।	সর্বোচ্চ এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমতে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।
বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	৪১	অপরাধ সংঘটনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করিলে বা উক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা প্রদান করিলে এবং উক্ত সহায়তা বা প্ররোচনার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হইলে।	উক্ত সহায়তাকারী বা প্ররোচনাকারী তাহার সহায়তা বা প্ররোচনা দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমতে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

চতুর্থ অধিবেশন	জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা : আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১. দেশের জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যাবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা;

২. এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

উপকরণ ঃ হ্যান্ডআউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার পেন, পোস্টার, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন ।

সময় ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ

প্রশিক্ষক এই অধিবেশনে-

- প্রথমে জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে ওই এলাকার জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত আঞ্চলিক সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করবেন;
- এরপর চিহ্নিত আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতি সমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরবেন এবং আলোচনা করবেন;
- আইন, বিধি ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ /প্রতিষ্ঠান সমূহ, তাদের কাঠামো ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দিবেন;
- এবং আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি সমূহ ভঙ্গ হলে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা, ক্ষতিগ্রস্থের জন্য প্রতিকার ও দোষী ব্যক্তির জন্য শাস্তি বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন ।

৪.১ জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা:

দেশের স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদপত্র প্রতিনিয়ত প্রচার করছে প্রাকৃতিক সম্পদের অব্যস্থাপনার খবর, ধ্বংসের খবর। প্রভাবশালীদের দ্বারা কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সাধারণের জীবন। যে জলাধারকে কেন্দ্র করে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় জীবন নির্বাহ করে থাকে তাদেরকে বাদ দিয়ে ব্যবস্থাপনা করা হয় দেশের মৎস্য উৎপাদনের জলাভূমিগুলো। জলাধার ভরাট করে তৈরি করা হয় বিভিন্ন স্থাপনা। কেবল প্রভাবশালী মহলই নয়, সরকার নিজেও কখনও কখনও তারই প্রণীত আইনি কাঠামোর তোয়াক্কা না করে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভার প্রকৃত মৎসজীবীদের না দিয়ে কোন প্রভাবশালী মহলের নিকট প্রদান করে থাকে। আবার সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় না থাকায়ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে দেশের জল, জলাধার ও মৎস্য সম্পদ।

৪.১.১ জলাধার

দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে জলাধারের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে-

জলাধার {বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, ধারা ২(কক)}:

নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়, দিঘি, পুকুর, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসেবে সরকারি ভূমি রেকর্ডে চিহ্নিত ভূমি বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত কোন জলাভূমি, বন্যা প্রবাহ এলাকা, সলল পানি ও বৃষ্টির পানি ধারণ করে এমন সকল ভূমিই জলাধার

জলাধার {প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০, ধারা ২ (চ)}:

নদী, খাল, বিল, দিঘি, ঝর্ণা, জলাশয় হিসাবে মাষ্টার পানে চিহ্নিত বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা কোন সংস্থা কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসেবে ঘোষিত কোন জায়গা এবং সলল পানি এবং বৃষ্টির পানি ধারণ করে এমন কোন ভূমি প্রাকৃতিক জলাধার হিসেবে গণ্য হইবে।

জলাধার {বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩, ধারা ২(৫)}:

জলাধার হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বা কৃত্রিমভাবে খননকৃত কোন নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়, দিঘি, পুকুর,হ্রদ, ঝর্ণা বা অনুরূপ কোন ধারক ।

জলমহাল {সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯ নীতি ২(গ)}:

জলমহাল এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাঁওড়, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা,হ্রদ, দিঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমন জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকিবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ভিতরে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকিবে না ।

৪.২ জল, জলাধার ও মৎস্য সংক্রান্ত আইনি বিধান ও নীতিসমূহ

৪.২.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২

জলাভূমি সংরক্ষণ: অনুচ্ছেদ ১৮ক

২০১১ সালে সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে জলাভূমি সংরক্ষণকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হইয়াছে। এ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবে।

৪.২.২ নগর উন্নয়ন আইন, ১৯৫৩:

- **ঢাকা মহানগরীর জন্য মাস্টার প্লান :**

ধারা ৭৩

এ ধারায় ঢাকা মহানগরীর জন্য একটি মাস্টার প্লান প্রণয়ন করার কথা বলা হইয়াছে এবং ধারা ৭৫-এ বলা হইয়াছে, মাস্টার প্লান কার্যকরী হবার পর যদি কোন জমি মাস্টার প্লানে জলাধার হিসেবে চিহ্নিত থাকে এবং কোন ব্যক্তি যদি সে জমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে চায়, তবে তাকে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন নিতে হইবে। পরবর্তীতে এ আইনের ক্ষমতা বলে ৩ আগস্ট, ১৯৯৭ তারিখে গেজেট প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর জন্য মাস্টার প্ল্যান হিসেবে আরবান এরিয়া প্ল্যান এবং স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়ন করা হইয়াছে যেখানে মহানগরীর জলাধারগুলোকে সকল ধরনের উন্নয়নের আওতামুক্ত রাখা হইয়াছে।

পরবর্তীতে ২২ জুন, ২০১০ তারিখে ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) গেজেটে প্রকাশিত হয়। যদিও ড্যাপ অদ্যাবধি জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি বিধায় এটি চূড়ান্ত কিনা তা জনসাধারণের বোধগম্য নয়।

৪.২.৩ মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০

শুধুমাত্র মহানগরী ও পৌর এলাকার জলাধারসমূহকে সংরক্ষণ করিতে মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ প্রণয়ন করা হয়।

- **প্রাকৃতিক জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তনে বাধা-নিষেধ:**

ধারা ৫

এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতীত প্রাকৃতিক জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না বা উক্তরূপ জায়গা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না বা অনুরূপ ব্যবহারের জন্য ভাড়া, ইজারা বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।

শাস্তি

ধারা ৮(১):

কোন ব্যক্তি যদি এ আইন লঙ্ঘন করে জলাধার ভরাট করে বা জলাধারকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তবে তার শাস্তি হইবে সর্বচ্চো ৫ বছর কারাদণ্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

ধারা ৮(২):

শাস্তি প্রদান ছাড়াও আইন লঙ্ঘন করে কেউ যদি জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তন করে তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নোটিশ দ্বারা তাকে বাধা প্রদান করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে অননুমোদিত নির্মাণকাজ ভেঙ্গে ফেলার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

কেইস স্টাডি-৪

জলাভূমি ভরাট এবং আদালতের রায়

মেট্রোমেকার্স অ্যান্ড ডেভেলপারস্ লি: কর্তৃক মাস্টার প্ল্যানে বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত আমিনবাজারের বিলামালিয়া ও বলিয়ারপুর মৌজাসমূহ দখল ও জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে ৪৬০৪/২০০৪ নং রিট মামলা দায়ের করা হয়। উল্লেখিত মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট "মধুমতি মডেল টাউন" প্রকল্পকে অবৈধ ঘোষণা করে বন্যা প্রবাহ এলাকা রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করেন। অত: পর উক্ত রায় থেকে সিভিল আপিল নং ২৫৩-২৫৬/২০০৯ উদ্ভূত হয়। আপীল বিভাগে মেট্রোমেকার্স অ্যান্ড ডেভেলপারস্ লি: কর্তৃক দায়েরকৃত আপিল খারিজ এবং বেলা কর্তৃক দায়েরকৃত আপিলটি গৃহিত হয়। আপিলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে গত ৭ আগস্ট, ২০১২ তারিখে আপীল বিভাগ রায় প্রদান করেন । উক্ত রায়ে আদালত "মধুমতি মডেল টাউন" প্রকল্পকে অবৈধ ঘোষণা করে। একইসাথে আদালত উক্ত দুটি মৌজার জলাধারগুলোকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে রাজউককে নির্দেশ প্রদান করে। আদালত আরোও উল্লেখ করে যে, জলাধারগুলোকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা মেট্রোমেকার্স অ্যান্ড ডেভেলপারস্ লি: প্রদান করবে। জলাধার রক্ষায় আদালতের এ এক যুগান্তকারী নির্দেশ ।

তথ্যসূত্র: কেইসটি বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) দায়েরকৃত রিট মামলা থেকে সংগৃহীত

৪.২.৫ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

- **জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ :**

ধারা ৬ঙ

২০১০ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ সংশোধনীর মাধ্যমে জলাধার সংরক্ষণের লক্ষ্যে ধারা ৬ঙ সংযোজন করা হইয়াছে যেখানে বলা হইয়াছে জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না।তবে অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে।

দণ্ড:

ধারা ১৫

এ ধারার বিধান লঙ্ঘন করে জলাধার শ্রেণি পরিবর্তন করলে তার শাস্তি হতে পারে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড বা ১০ লক্ষ্য টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

৪.২.৬ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

- **জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ:**

ধারা ২০

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কোন জলাধারে স্থাপনা নির্মাণ করে বা ভরাট করে বা জলাধার হতে মাটি বা বালু উত্তোলন করে জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ বা প্রবাহে বাধা সৃষ্টি বা গতিপথ পরিবর্তন বা পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে পারিবে না ।

- **নির্বাহী কমিটি :**

ধারা ৯

এ ধারার বিধান অনুযায়ী গত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি করা হইয়াছে।

- **জলাধার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা:**

ধারা ২২ (১)

আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, নির্বাহী কমিটির নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে,-

(ক) কোন প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে সুপেয় পানির তীব্র সংকট থাকায় সুপেয় পানির উৎস হিসাবে কোন দিঘি, পুকুর বা অনুরূপ কোন জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন; বা

(খ) অতিথি পাখির নিরাপদ অবস্থান, অবাধ বিচরণ এবং অভয়াশ্রম নিশ্চিত করিবার জন্য কোন হাওর, বাঁওর বা অনুরূপ কোন জলাধার সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন,-

তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি, সীমানা নির্ধারণ করিয়া, সুপেয় পানির উৎস হিসাবে সংশ্লিষ্ট জলাধার সংরক্ষণের জন্য উহার মালিক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুরক্ষা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ধারা ২২ (২)

নির্বাহী কমিটির কাছে যদি মনে হয় কোন জলাধার সংরক্ষণ করা প্রয়োজন তবে, নির্বাহী কমিটি সীমানা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট জলাধার সংরক্ষণের জন্য তার মালিক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুরক্ষা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

- **অপসারণ আদেশ ইস্যু করিবার ক্ষমতা:**

ধারা ১৩(১):

এ আইন বা সুরক্ষা আদেশের কোন বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করে যদি কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদের উপর এমন কোন স্থাপনা নির্মাণ করে বা ভরাটের মাধ্যমে জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি বা গতিপথ পরিবর্তন করে তবে উক্ত নির্বাহী কমিটি বা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে নির্মিত স্থাপনা অপসারণ করিতে এবং ভরাটের ক্ষেত্রে ভরাট কাজে ব্যবহৃত উপকরণ বা উপাদান অপসারণের জন্য কোন ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট সময় সাপেক্ষে অপসারণ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

ধারা ১৩(৪):

নির্বাহী কমিটি অপসারণ আদেশে যে সময় উল্লেখ করিবে তার মধ্যে স্থাপনা অপসারণ বা ভরাট কার্যক্রম বন্ধ না করলে এ ধারা অনুযায়ী নির্বাহী কমিটি উক্ত স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রমে ব্যবহৃত উপকরণ জলাধার থেকে অপসারণ করিতে পারিবে এবং অপসারণের প্রকৃত খরচ ভরাট কারীর নিকট থেকে আদায় করিতে পারিবে ।

- **প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘন করিবার দণ্ড, অর্থদণ্ড ও জরিমানা:**

ধারা ২৯(১)

কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সুরক্ষা বা প্রতিপালন আদেশ লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি হতে পারে সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

৪.২.৭ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯-এ সিটি কর্পোরেশনকে তার নির্ধারিত এলাকার মধ্যে অবস্থিত জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

- **সিটি কর্পোরেশনর ক্ষমতা**

তৃতীয় তফসিলের ক্রমিক নং ৮.১৫:

কর্পোরেশন নগরীর মধ্যে অবস্থিত সকল পানির উৎস, ঝর্ণা, নদী, দিঘী, পুকুর ও ধারা বা এর কোন অংশকে সরকারি জলাধার হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে (ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যতিত) ।

তৃতীয় তফসিলের ক্রমিক নং ৮.১৬:

সরকারি জলাধারে চিত্ত-বিনোদন এবং জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং পানি সেচ, পানি নিষ্কাশন ও নৌ-চলাচল এর উন্নয়ন ও সংস্কার করিতে পারিবে।

তৃতীয় তফসিলের ক্রমিক নং ৮.১৭:

কর্পোরেশন তার আওতাভুক্ত সকল জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকিবে।

৪.২.৮ নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন:

জলাধার হিসেবে নদীর গুরুত্ব বিবেচনা করে শুধুমাত্র নদী ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছে বিশেষ বিশেষ কিছু আইন। যারমধ্যে The Bangladesh Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958; The Prevention of Interference with Aids to Navigable Waterways Ordinance, ১৯৬২; এবং এ আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা, ১৯৭৩; বন্দর আইন, ১৯০৮; এবং এ আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা, ১৯৬৬; নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩; বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০; এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০-এর বিধানসমূহ উল্লেখযোগ্য।

৪.২.৯ The Prevention of Interference with Aids to Navigable Waterways Rules, 1973

নৌ পথের সংজ্ঞা: বিধি ২(১)

এ বিধিতে অভ্যন্তরীণ নৌ পথের সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। এ বিধিতে বলা হইয়াছে সকল নদী বা খাল, লেক, হাওর, বিল এবং শোর যেখানে বছরের কোন সময় নৌযান চলাচল করিতে পারে সেটাই অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ।

৪.২.১০ বন্দর আইন, ১৯০৮:

বন্দর আইন, ১৯০৮-এ নদীকে নাব্য এবং ধারা (চ্যানেল) হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা হইয়াছে।

নদীর তীরে স্থাপনা নির্মাণ বা খনন :

বিধি ৫৪

এ বিধান অনুযায়ী বন্দর সংরক্ষকের নিকট হতে লাইসেন্স ব্যতিত নদীর তীরে, ফোর শোরে বা আভ্যন্তরীণ নৌ-পথের কোন স্থানে কোন স্থাপনা নির্মাণ বা খনন করা যাইবে না। এ বিধি অনুযায়ী বন্দর সংরক্ষক বন্দর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যকর করিতেই শুধুমাত্র এরূপ লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

৪.২.১১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০:

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ এর অধীনে গঠিত হইয়াছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

বোর্ডের কার্যাবলি:

ধারা ৬

এ ধারা অনুযায়ী বোর্ডের নিম্নরূপ কার্যাবলি প্রদান করা হইয়াছে-

- নদী ও নদী অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের জন্য জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;
- সেচ, মৎস্য চাষ, নৌ-পরিবহণ, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন বা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;
- ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;এবং
- নদীর তীর সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙন থেকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ।

৪.২.১২ ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০

নাব্য নদীর সংজ্ঞা :

অনুচ্ছেদ ৩৩৩

এ অনুচ্ছেদ এ নাব্য নদীর পরিচয় দেয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে নদীতে বছরের সকল সময় নৌযান চলাচল করিতে পারে তা নাব্য নদী হিসেবে গন্য হইবে। আরো বলা হইয়াছে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কালেক্টর হইবে সকল নাব্য নদী ও নদী প্রবাহের তত্ত্বাবধায়ক এবং এ ধরনের সকল নদী, সংযোগ খাল, নদী প্রবাহসমূহের তলদেশ ও ফোরশোরসমূহের উপর সরকারের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকিবে ।

নদী তীরবর্তী ভূমি মালিকের অধিকার নেই :

অনুচ্ছেদ ৩৩৭

এ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নদী তীরবর্তী কোন ভূমি মালিকের নদীর তলদেশ বা ফোরশোরের উপর কোন অধিকার নেই।

অনুপ্রবেশঃ

অনুচ্ছেদ ৩৩৯

তাছাড়া জনস্বার্থের পরিপন্থি কোন প্রকার অনুপ্রবেশের অনুমতি বা লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না ।

৪.২.১৩ বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০

বালু মহাল ঘোষণাঃ

ধারা ৯

২০১০ সালে প্রণীত বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ধারা ৯ এ বালু মহাল ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

ধারা ৯(২):

বালু মহাল ঘোষণার পূর্বে জেলা প্রশাসককে পরিবেশ, পাহাড় ধ্বস, ভূমি ধ্বস বা নদী বা খালের পানির স্রোতের গতিপথ পরিবর্তন, সরকারি স্থাপনার (যথা- ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, ফেরিঘাট, হাটবাজার, চা-বাগান, নদীর বাঁধ ইত্যাদি) এবং আবাসিক এলাকার কোন ক্ষতি হইবে কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

ধারা ৯(৩):

কোন বালুমহাল থেকে বালু বা মাটি উত্তোলন করার ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত বা জনস্বার্থ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা থাকলে জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনারের নিকট উক্ত বালু মহাল বিলুপ্ত ঘোষণা করার প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারিবে।

কতিপয় ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলন নিষিদ্ধ

ধারা ৪

বিপণনের উদ্দেশ্যে কোন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া বা নদীর তলদেশ হইতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না-

(ক) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা থেকে বালু উত্তোলন করা যাইবেনা।

(খ) নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৎস্য, জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদ বিনষ্ট হলে বা হবার আশঙ্কা থাকলে নদীর তলদেশ থেকে বালু উত্তোলন করা যাইবে না।

ভূ-গর্ভস্থ বা নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন সংক্রান্ত বিশেষ বিধান:

ধারা ৫
ভূ-গর্ভস্থ বা নদীর তলদেশ থেকে পাম্প বা ড্রেজিং বা অন্য কোন মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না।

ধারা ৫(২):
নদীর তলদেশ হতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তলদেশ সুষম স্তরে খনন করা যায় এমন ড্রেজার ব্যবহার করে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে ।

ধারা ৫(৩):
ড্রেজিং কার্যক্রমে বাল্কহেড বা প্রচলিত বলগেট ড্রেজার ব্যবহার করা যাইবে না ।

কেইস স্টাডি-৫

নদী থেকে অনিয়ন্ত্রিত বালু উত্তোলন

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের সুস্পষ্ট বিধান থাকার পরও যত্রতত্র নদী থেকে অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এরই একটি উদাহরণ দোবাজন চলতি নদী থেকে বালু উত্তোলনের চিত্র। সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভপুর উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দোবাজান নদী হতে বোমা মেশিন ও ড্রেজার মেশিন দিয়ে পাথর ও বালু উত্তোলন বন্ধ এবং নদীর প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও নদী এলাকায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষার জন্য -বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) ২০১৩ সালে একটি রিট পিটিশন (নং-৭৪৩১/১৩) দায়ের করে। উক্ত মামলায় পক্ষগণের প্রাথমিক শুনানি শেষে ২২ জুলাই, ২০১৩ তারিখে সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ডোবাজান চলতি নদী থেকে পাথর ও বালু উত্তোলন কেন আইন বর্হিভুত ও জনস্বার্থ বিরোধী ঘোষণা করা হবে না এবং নদীটি সংরক্ষণের নির্দেশ কেন প্রদান করা হবে না তা জানতে চেয়ে বিবাদীগণের উপর রূল জারি করেন। একইসাথে আদালত উপরোক্ত রুল বলবৎ থাকাকালীন সময়ে দোবাজন চলতি নদী থেকে ড্রেজার ও এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে পাথর ও বালু উত্তোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সেইসাথে আদালত আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নদীর ক্ষতি সাধনের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও আদায় করা কেন হবে না তাও জানতে চেয়েছেন। পরবর্তীতে গত ১৪ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে আদালতের একই বেঞ্চ ডোবাজান চলতি নদী থেকে ড্রেজার ও এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে পাথর ও বালু উত্তোলন বন্ধের নির্দেশ সম্বল্বিত আদেশ পরবর্তী ৬ মাসের জন্য বর্ধিত করে। পরিতাপের বিষয় আদালতের আদেশ এবং আইনি বিধান থাকা সত্ত্বেও এ নদী থেকে ড্রেজার ও এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে পাথর ও বালু উত্তোলন চলছে যদিও স্থানীয় প্রশাসন দাবি করছে বালু ও পাথর উত্তোলনের কার্যক্রম বন্ধ আছে।

তথ্যসূত্র: কেইসটি বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) দায়েরকৃত রিট মামলা থেকে সংগৃহীত

৪.২.১৪ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩:

সম্প্রতি নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হইয়াছে।

"জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন" কার্যাবলি:

ধারা ১২

এ আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী ৫ সদস্য বিশিষ্ট "জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন" নামে একটি কমিশনের গঠন প্রদান করা হইয়াছে এবং ধারা ১২ এ কমিশনের নিম্নরূপ কার্যাবলি উলেখ করা হইয়াছে-

১) নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সরকারকে সুপারিশ করা;
২) নদী অবৈধ দখলমুক্ত এবং পুনঃদখলরোধ করা বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা:
৩) নদী এবং নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
৪) নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
৫) বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খননের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
৬) নদী সংক্রান্ত তথ্য ভাণ্ডার উন্নয়নকরণে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
৭) নদী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নিকট যে কোন সুপারিশ প্রদান করা
৮) নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
৯) নদী রক্ষাকল্পে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান করা;
১০) নদী রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;
১১) নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণক্রমে সুপারিশ প্রদান করা;
১২) নদী রক্ষা সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ পর্যালোচনাক্রমে ও প্রয়োজনবোধে উক্ত আইন ও নীতিমালা সংশোধনের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা; এবং
১৩) দেশের খাল, জলাশয় এবং সমুদ্র-উপকূল দখল ও দূষণমুক্ত রাখার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করা।

৪.২.১৫ দণ্ডবিধি, ১৮৬০

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এ গণউপদ্রবের কথা বলা হইয়াছে।

- **গণ উপদ্রব :**

ধারা ২৬৮
এ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি পাশে বসবাসকারী বা জনসাধারণের কোন ক্ষতি বা বিপদ বা বিরক্তি সৃষ্টি করে বা কোন গণ-অধিকার বিনষ্ট করে সে ব্যক্তি গণ উপদ্রবের অপরাধে দোষী হিসেবে গণ্য হইবে । এ দণ্ডবিধিতে মোট ১১ ধরণের কাজকে গণ উপদ্রবের অপরাধ হিসেবে উলেখ করা হইয়াছে যার মধ্যে পানি দূষিত করা একটি।

- **জলাধারের পানি দূষিত করা :**

ধারা ২৭৭
কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জলাধারের পানি দূষিত বা কলুষিত করে ব্যবহারের অনুপযোগী করে তোলে তবে তার শাস্তি হইবে সর্বোচ্চ তিন মাস কারাদণ্ড বা ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড ।

৪.২.১৬ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯

দেশের খাস জলাশয় ও জলামহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনূকুলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, প্রণয়ন ২০০৯ করেছে যা ২০১০ সালে

সংশোধন করা হইয়াছে। এ নীতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন এবং জলমহাল-এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে-

- **প্রকৃত মৎস্যজীবীর সংজ্ঞা :**

নীতি ২ (ক)

যিনি প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ শিকার ও বিক্রয় করে প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করেন তাকেই প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গন্য হইবেন।

- **মৎস্যজীবী সংগঠন এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা:**

নীতি ২ (খ)

প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হইবে না। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করিতে পারিবেন না।

- **জলমহাল এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা:**

নীতি ২ (গ)

জলমহাল এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাঁওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দিঘি, খাল, নদী সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমন জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকিবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকিবে না।

- **বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমঝোতা স্বারকের মাধ্যমে জলমহাল ব্যবস্থাপনা:**

২০০৯ সালের জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে জলমহাল অন্য মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর হতে পারে এবং তাদের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা হতে পারে। বর্তমান অবস্থায় বেশ কিছু জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয় হতে হস্তান্তরিত হয়ে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ অন্যন্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হইয়াছে। উল্লেখিত জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনা সমঝোতা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনা করিবেন।

- **জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি :**

নীতি ৩

বিভিন্ন মন্ত্রাণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দফতর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

- **২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা :**

নীতি ৪

যুব সমাজের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ একর পর্যন্ত সকল বদ্ধ জলমহালসমূহ ইতিপূর্বে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইজারা প্রদান করা হতো। সে জন্য উলেখিত জলমহালগুলি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে উলেখিত জলমহালগুলি অন্যান্য জলমহালগুলির ন্যায় ইজারা প্রদান করা হইবে। তবে এ ক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবীদের নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাইবে।

- **২০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা:**

নীতি ৫

জাল যার জলা তার নীতির আলোকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে, জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সেই সকল সমিতি উল্লেখিত জলমহাল ইজারা বা ব্যবস্থাপনা করার জন্য আবেদন করিতে পারে। উল্লেখ্য প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত সমিতিতে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে কোন সদস্য থাকলে ইজারার জন্য আবেদন করিতে পারিবে না। ২০ একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহালসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সমঝোতার ভিত্তিতে ৩ বছর মেয়াদে স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমিতিকে বন্দোবস্ত দিতে পারিবে ।

- **উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত বিধান:**

নীতি ৭

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্ধ্বে সীমিত সংখ্যক জলমহাল ৬ বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়া যাইবে। অতঃপর জেলাপ্রশাসক, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের মতামত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন। আবেদনকারী আবেদনের সাথে ২০% জামানত প্রদান করিবেন। অতঃপর সার্বিক বিবেচনা করে ভূমি মন্ত্রণালয় ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

- **ইজারাকৃত জলমহাল সাবলিজ দেয়া সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা:**

নীতি ৯

ইজারাকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলিজ দেয়া যাইবে না। যদি সাবলিজ দেয়া হয় তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করিবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারার মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে। এবং ঐ ইজারা গ্রহীতা পরবর্তী ৩ বছরের জন্য কোন জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না।

- **২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলাশয় ইজারা প্রদান করা যাইবে না এমন জলমহাল:**

নীতি ১৫

গুচ্ছগ্রাম, আদর্শগ্রাম, আশ্রয়নপ্রকল্প বা অনুরূপ এলাকাভুক্ত এলাকায় অবস্থিত জলাশয়সমূহ; অর্পিত এবং পরিত্যাক্ত জলাশয়সমূহ; ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সরকারি কমিশনার (ভূমি) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারের অফিস সংলগ্ন সরকারি খাস জলাশয়সমূহ; সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গোরস্থান, পাবলিক ইজমেন্টের জন্য ব্যবহৃত জলাশয়সমূহ; সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং জেলা পরিষদের প্রশাসনিক সীমার মধ্যে অবস্থিত তাদের নিজস্ব জলাশয়সমূহ ইজারা প্রদান করা যাইবে না।

৪.২.১৭ মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০:
মৎস্য সংরক্ষণ ও রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত এ আইনে মাছের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে-

- **মাছের সংজ্ঞা : ধারা ২(২)**

এ আইন অনুযায়ী সকল কাঁটা যুক্ত মাছ, বাগদা চিংড়ি, শলা চিংড়ি, উভচর প্রাণী, কচ্ছপ, শক্ত খোলশযুক্ত প্রাণী, ঝিনুক, শামুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণী এবং জীবন বৃত্তান্তের সকল স্তরের ব্যাঙ "মাছ" এর অন্তর্ভুক্ত।

- **স্থিরকৃত ইঞ্জিন এর সংজ্ঞা :ধারা ২(৬)**

স্থিরকৃত ইঞ্জিন (Fixed Engine) বলতে মাছ শিকারের জন্য মাটির সাথে সংযুক্ত বা অন্য কোন ভাবে স্থীরকৃত কোন জাল, খাঁচা (পিঞ্জর), ফাঁদ বা অন্য কোন কৌশলকে বুঝায়।

- **মৎস্য আইনে নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ কার্যক্রম :**

ধারা ৩
এ ধারা অনুযায়ী বিধি দ্বারার নিম্নলিখিত যে কোন বিষয় নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। যথা-

- স্থিরকৃত ইঞ্জিনের স্থাপন ও ব্যবহার;
- স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কোন বাঁধ, বেড়ীবাঁধ, নদীতে আড়াআড়িভাবে দেয়া বা যে কোন প্রতিবন্ধক এবং অন্য কোন ধরনের কাঠামো নির্মাণ;
- যে কোন ধরনের মাছ ধরার জালের ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি এবং এরূপ জালের ফাঁসের আকার;
- মাছ ধরার জাল, ফাঁদ, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কৌশলের উৎপাদন আমদানি, বাজারজাতকরণ, বহন, পরিবহন বা দখলে রাখা;
- আভ্যন্তরীণ জলরাশি বা রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমায় বিস্ফোরক দ্রব্য বন্দুক, তীরধনুক দ্বারা মাছ মেরে ফেলা বা মারার উদ্যোগ নিষিদ্ধ করিতে পারে;
- পানিতে বিষ প্রয়োগ, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ বা অন্য কোনভাবে মাছ ধ্বংস করা বা এরকম উদ্যোগ গ্রহণ নিষিদ্ধ করিতে পারে;
- যে মৌসুমে বা সময়ের মধ্যে কোন নির্ধারিত প্রজাতির মাছ ধরা বা বিক্রয় নিষিদ্ধ তা নির্ধারণ করিতে পারে;
- সকল জলাশয়ে বা নির্ধারিত জলাশয়ে নির্ধারিত সময় কালের মধ্যে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করিতে পারে।
- মৎস্য ক্ষেত্র শুকিয়ে ফেলা অথবা মৎস্য ক্ষেত্র থেকে পানি অপসারণের মাধ্যমে মাছ ধ্বংস বা ধ্বংসের উদ্যোগ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করিতে পারেন।

তবে সরকার মৎস্য চাষ তথ্য সংগ্রহ, মৎস্য সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্তসাপেক্ষে নিষিদ্ধ মৌসুমে বা নিষিদ্ধ জলাশয়ে বা সর্বনিম্ন সাইজের নিচে মাছ ধরার অনুমতি দিতে পারেন।

- **দণ্ড:**

ধারা ৫ (১)
কোন ব্যক্তি ধারা ৩ এ বর্ণিত কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে সর্বনিম্ন ১ বছর অথবা সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড বা ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ।

- **কারেন্ট জাল এর সংজ্ঞা :**

ধারা ২(৫)

স্থানীয় ভাবে পরিচিত কারেন্ট জাল, জাপানি কারেন্ট জাল, ফান্দিজাল, ফাঁসজাল, ফাঁপাজাল, বাঁধাজাল, কাঠিজাল কারেন্ট জাল নামে পরিচিত। পরবর্তীতে মৎস্য রক্ষা সংরক্ষণ আইনের সংশোধনের মধ্য দিয়ে মনোফিলামেন্ট, সিনথেটিক নাইলন ফাইবার দিয়ে তৈরি বিভিন্ন আকারের জালের বুনন কে কারেন্ট জাল হিসেবে বলা হইয়াছে।

- **কারেন্ট জাল ব্যবহার নিষেধাজ্ঞা :**

ধারা ৪ক

সকল প্রকার কারেন্টজাল উৎপাদন, বুনন, আমদানি, গুদামজাতকরণ, বহন, পরিবহন ও নিজের আয়ত্তে রাখা নিষিদ্ধ।

- **কারেন্ট জাল ব্যবহার এর দণ্ড :**

ধারা ৫(২)(খ)

সকল প্রকার কারেন্ট জাল উৎপাদন বুনন আমদানি গুদামজাতকরণের জন্য ৩-৫ বছর কারাদণ্ড ও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হইয়াছে। কারেন্ট জাল বহন পরিবহন নিজ আয়ত্তে রাখা ও ব্যবহারের জন্য ১-৩ বছরের কারাদণ্ড অথবা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

- **সম্পূর্ণরূপে পানি শুকিয়ে বা আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণে বাধানিষেধ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন :**

ধারা ৩

এ ধারা অনুযায়ী মৎস্য ক্ষেত্র থেকে পানি নিষ্কাশনের দ্বারা কোন জলাশয়ের মৎস্য বিনাশ বা তৎমর্মে উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে, এ আইনে বিধি প্রণয়নের কথা বলা আছে। মৎস্যনীতি ১৯৯৮ এ খাল, বিল, ডোবা, নালা ও অন্যান্য জলাশয়কে পানি শূন্য করা যাইবে না এবং আড়াআড়ি ভাবে স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী হোক কোন প্রকার বাঁধ নির্মাণ করা যাইবে না।

৪.২.১৮ মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৮৫

মৎস্য সংরক্ষণ ও রক্ষা আইন, ১৯৫০-এর ধারা ৩-এর ক্ষমতাবলে সরকার মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৮৫ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের মধ্যে রয়েছে-

- **স্থিরকৃত ইঞ্জিন (কাঠা) ব্যবহার করে মাছ ধরা সংক্রান্ত বিধিনিষেধঃ**

বিধি ৩

কোন ব্যক্তি নদী-নালা খাল ও বিলে স্থিরকৃত ইঞ্জিন ব্যবহার বা স্থাপন নির্মাণ বা ব্যবহার করিতে পারিবে না। এই নিয়ম অমান্য করে মাছ ধরা হলে ধৃত মাছ আটক, অপসারণ এবং বাজেয়াপ্ত করা যাইবে। এই নিয়মটি করার উদ্দেশ্য হলো কেউ যেন মাছ কে আটকিয়ে রাখার জন্য স্থিরকৃত ইঞ্জিন (কাঠা) ব্যবহার না করে।

- **মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়**

বিধি ৭

প্রতি বছর ১লা এপ্রিল হতে ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত নদ-নদী, খাল-বিল অথবা নদী, খাল ও বিলের সাথে সাধারণত সরাসরি সংযুক্ত কোন জলাশয়ে দলবদ্ধভাবে বিচরণরত শোল, গজার এবং টাকি মাছের রেণু/পোনা এবং ঐ গুলির পাহারাদার হিসেবে বিচরণরত মূল মাছ মারা যাইবে না; তবে শর্ত থাকে যে, পোনা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত জাতের পোনা এবং মূল মাছ ধরা বা ধ্বংস করবার ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

- **মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধঃ**

বিধি ৮(১)

মাছের প্রজাতি এবং সাইজ অনুসারে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। কার্পাস প্রজাতি যেমন- কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউশ এবং গনিয়া মাছসমূহ যা ২৩ সেন্টিমিটারের নীচে সেই সকল মাছ প্রতি বৎসর জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত, ইলিশ প্রজাতি (বাংলাদেশের কোন কোন অংশে জাটকা হিসেবে বহুল পরিচিত) যা ২৩ সেন্টিমিটারের নীচে প্রতি বৎসর নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত, পাংগাস প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে হিলসার নিয়ম প্রযোজ্য, সিলন, বোয়াল এবং আইড় প্রজাতির মাছ যা ৩০ সেন্টিমিটারের এর নীচে সেই সকল মাছ প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি হইতে জুন পর্যন্ত নিধন নিষিদ্ধ রয়েছে।

- **মৎস্য অভয়াশ্রম**

মৎস্যনীতি, ১৯৯৮ তে বলা হইয়াছে যে, মৎস্য অভয়াশ্রমের নিমিত্তে চিহ্নিত জলমহাল বা এর অংশ বিশেষ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হইবে। এছাড়া এই নীতি অনুযায়ী মৎস্য উৎপাদন, বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে উপযোগী জলাশয় ও জলমহাল ইত্যাদি এলাকার সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হইবে।

৪.২.১৯ মেরিন ফিশারিজ অর্ডিনেন্স, ১৯৮৩

- **বিদেশি মৎস্য শিকারি নৌযানের বাংলাদেশে মৎস্য জলাশয়ে প্রবেশের নিয়মঃ**

ধারা ২০

সাধারণত কোন বিদেশি নৌযান মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মৎস্য জলাশয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তবে বাংলাদেশ-কর্তৃপক্ষের নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক প্রবেশ করিতে পারিবে এবং লাইসেন্সে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক মৎস্য শিকার করিতে পারিবে ।

- **বিদেশি মৎস্য শিকারি নৌযানের বাংলাদেশে মৎস্য জলাশয়ে প্রবেশের নিয়মের ব্যতিক্রম :**

ধারা ২১

কিন্তু বাংলাদেশের মৎস্য জলাশয়ের উপর দিয়ে অন্য কোন দেশের জলাশয়ে যাতায়াত, বিপদকালীন নিরাপত্তা, কোন নাবিকের চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে লাইসেন্স ছাড়া কোন বিদেশি মৎস্য শিকারি নৌযান বাংলাদেশ-মৎস্য জলাশয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে। তবে এ ক্ষেত্রে উক্ত নৌযানকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলি পালন করিতে হইবে এবং বাংলাদেশ মৎস্য জলাশয়ে প্রবেশ করবার উদ্দেশ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে যথা সম্ভব দ্রুত বাংলাদেশের জলাশয় ত্যাগ করিতে হইবে।

- **বিস্ফোরক এর ব্যবহারঃ**

ধারা ২৬

মৎস্য নিধন বা সহজে মাছ ধরবার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক, বিষ ও অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রব্য প্রয়োগ বা প্রয়োগের উদ্যোগ বা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে উক্ত দ্রব্য বহন বা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্ধারিত নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা বা নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম নৌযানে রাখাকে অত্র আইনে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এবং তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হইয়াছে। অত্র আইনের অধীন প্রণীত বিধি লঙ্ঘন করে কোন মৎস্য আহরণ করা হলে বা যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও জেনে শুনে উক্ত মাছ গ্রহণ বা নিজ দখলে রাখলে একই অপরাধ হইবে বলে বলা হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি উল্লেখিত অপরাধে অপরাধী হয় সে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জরিমানা বা নিষিদ্ধ উপায়ে আহরিত মৎস্যের ১৫ গুণ এই দুইয়ের মধ্যে যা বেশি সেই অঙ্কের টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

- **সামুদ্রিক রিজার্ভ**

ধারা ২৮

কোন স্থানে বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে অনুভূত হলে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশের মৎস্য জলাশয়ের যে কোন এলাকা এবং যথোচিত কোন পাশ্ববর্তী বা চতুর্পার্শ্বের ভূমিকে সামুদ্রিক রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা দিতে পারেন। সামুদ্রিক রিজার্ভের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল এলাকার জলজ, উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুলকে বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান এবং জলজ প্রাণীর প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র ও আবাসস্থলের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ বিশেষ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলকে নির্মূলের বিপদ হতে রক্ষা করার; অথবা ঐ সকল এলাকার স্বাভাবিক জলজ জীবনের পুনঃজন্মের সুযোগ সৃষ্টি করার বা যে এলাকায় অনুরূপ জলজ প্রাণী নিঃশেষ হয়ে গেছে; অথবা ঐ সকল এলাকার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন ও গবেষণা করার; অথবা ঐ সকল এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংরক্ষণ এবং বর্ধিত করা।

- **সামুদ্রিক রিজার্ভে নিষিদ্ধ কার্যক্রম**

ধারা ২৯

সামুদ্রিক রিজার্ভে মাছ শিকার, ড্রেজিং ইত্যাদি নিষিদ্ধ। সামুদ্রিক রিজার্ভে অনুমতি ছাড়া মাছ শিকার করে বা তৎমর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করে; অথবা ড্রেজিং করে, বালি ও কাঁকড় নিষ্কাশন করে, বর্জ্য পদার্থ বা অন্য কোন দূষিত পদার্থ নিক্ষেপ করে বা জমা করে অথবা অন্য কোনভাবে মাছ বা মাছের প্রজনন ক্ষেত্র বা আবাসস্থলের ব্যাঘাত ঘটায়, পরিবর্তন বা ধ্বংস করে; অথবা উক্ত রিজার্ভমুক্ত কোন ভূমি বা জলাশয়ে বিল্ডিং বা অন্য কোন গৃহাদি নির্মাণ বা উত্তোলন করে, তবে সে একটি অপরাধে অপরাধী হইবে এবং অনধিক এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। উল্লেখিত নিষিদ্ধ কাজ করবার অনুমতি প্রদান করা যায় যদি রিজার্ভের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যের জন্য অনুরূপ কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৪.২.২০ মৎস্য সংরক্ষণে অন্যান্য বিধানঃ

ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক প্রজনন বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিধিবিধানগুলো

আমাদের দেশে প্রায় সারা বৎসর ইলিশ মাছ ধরা হলেও প্রতি বৎসর আগস্ট হতে অক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশি পরিমানে মাছ (৬০-৬৫%) ধরা পড়ে। উক্ত সময়ে প্রায় ৭০-৮০% মাছ পূর্ণমাত্রায় পরিপক্ক থাকে এবং অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার "জো" এর সময় সবচেয়ে বেশি পরিমানে ডিম ছেড়ে থাকে। বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগতভাবে এ সময়ে ব্যাপকভাবে পরিপক্ক মাছ ধরার ফলে প্রাকৃতিকভাবে ইলিশ মাছের ডিম উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। কাজেই প্রাকৃতিকভাবে অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার "জো" এর সময় প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে কিছুদিন মাছ আহরণ বন্ধ রাখা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে মেঘনা নদীর মোহনায় ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন এলাকার উক্ত বড় পূর্ণিমার ১০

দিনের এক "জো", ৩০ আশ্বিন হতে ৯ কার্তিক পর্যন্ত (১৫-২৪ অক্টোবর) ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে ।

৪.২.২১ মৎস্য নীতি-১৯৯৮

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও এর প্রবৃদ্ধির পরিপন্থী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানারূপ প্রতিকূল পরিবর্তন, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির অভাব কিংবা প্রাপ্তিসাধ্য জনশক্তির যথাযথ ব্যবহার না হওয়া, প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি ছাড়াও সর্বোপরি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় মৎস্য নীতির অভাব এই সেক্টরের আশানুরূপ উন্নয়ন না হওয়ার অন্যতম কারণ। এ সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান করে মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতিকল্পে জাতীয় মৎস্য নীতি প্রণয়ন করা হইয়াছে। নিম্নে এর উদ্দেশ্য তুলে ধরা হইলো-

- **জাতীয় মৎস্য নীতির উদ্দেশ্যাবলি:**

১. মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
২. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
৩. প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ ;
৪. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন; এবং
৫. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।

- **অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি (নীতি ৫.০)**

নীতি ৫.২

মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইজারা প্রথা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের অনুকূলে উৎপাদনভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হইবে এবং মৎস্য আহরণ সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় সীমিত রাখা হইবে ।

নীতি ৫.২.১

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্য উপযোগী জলাশয়/জলমহালের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষে "মৎস্য অভয়াশ্রম" গড়ে তোলা হইবে ।

নীতি ৫.২.২

মৎস্যজীবী সংগঠন ও স্থানীয় সরকারসমূহের মাধ্যমে চিহ্নিত মৎস্য অভয় আশ্রমসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করিবে। চিহ্নিত জলাশয়সমূহের বরাদ্দ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে ।

নীতি ৫.২.৩

মৎস্য অভয়াশ্রমের নিমিত্তে চিহ্নিত জলমহাল বা এর অংশবিশেষ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত হইবে।

নীতি ৫.৩

বিল, হাওর ও অন্যান্য প্লাবন ভূমিতে বিশেষ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পসমূহের অন্তর্ভুক্ত বাঁধ পরিবেষ্টিত অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির পোনা ছেড়ে মাছ ও ধান চাষের সমন্বিত মডেল সম্প্রসারণ করা হইবে ।

- **অভ্যন্তরীণ বদ্ধজলাশয়ের মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা নীতি (নীতি ৬.০)**

নীতি ৬.১

দেশের সকল পুকুর ও দিঘি এবং অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্য চাষ উৎসাহিত করা হইবে। বিদেশি প্রজাতির মাছের চাষ প্রবর্তনের পূর্বে ঐ প্রজাতির মাছ দেশিয় প্রজাতির মাছের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে কিনা এবং পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য ক্ষতিকারক হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করত ফলাফল ইতিবাচক হলে কেবল ঐ সকল বিদেশি প্রজাতির মাছের চাষ উৎসাহিত করা হইবে ।

নীতি ৬.৩

মৎস্য চাষে মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ ও তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হইবে ।

নীতি ৬.৪

ভাসমান দরিদ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বিকল্প উপার্জনের উৎসের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে হাওর, বাঁওড় ও সম্ভাব্য অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্য চাষের উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হইবে।

নীতি ৬.৪.১

সরকারি খাস দিঘি, পুকুর কিংবা অন্যান্য জলাশয় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিত্তহীন প্রান্তিক চাষি ও গরিব মৎস্যচাষি, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার যুবক/যুব মহিলা ও লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হইবে। দরপত্র লব্ধ আয়ের অর্থ নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে সরকারি খাতে কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ তহবিলে জমা হইবে।

৪.৩ উপরোক্ত আইন বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান

আইনের নাম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	রাষ্ট্র (সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ)।
জলমহাল পলিসি, ২০০৯	ভূমি মন্ত্রণালয়
মৎস্য আইন, ১৯৫০ ও বিধিমালা, ১৯৮৫	মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড
ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০	ভূমি মন্ত্রনালয়, জেলা প্রশাসক
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর
বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০	ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক
মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০	রাজধানীর জন্য রাজউক
বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ওয়ারপো
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

৪.৪ বিচারিক ব্যবস্থা

৪.৪.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের

অণুচ্ছেদ নং ১০২
জলাধার সংরক্ষণে এবং প্রকৃত মৎসজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রিট মামলা দায়ের করা যাইতে পারে।

৪.৪.২ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণঃ

ধারা ৭
প্রতিবেশ ব্যবস্থার দূষণের ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা বা উক্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারি মামলা বা উভয় প্রকার মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

ক্ষতিপূরণের মামলা দায়েরঃ

ধারা ১৭
এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি লঙ্ঘনের ফলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইলে, উক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ, অথবা তাহাদের পক্ষে মহাপরিচালক পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

৪.৪.৩ মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০

মৎস্য আইনে অপরাধের বিচারঃ

ধারা ৭
মৎস্য সংরক্ষণ আইনের বিধান লঙ্ঘনের বিচার ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হইবে।

৪.৪.৪ মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০

অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে কতিপয় ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতাঃ

ধারা ৯
এ আইনের অধীনে অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে। উল্লেখ্য ধারা ১২ অনুযায়ী এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ আমলযোগ্য বা ধর্তব্য অপরাধ হইবে।

৪.৪.৫ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ

ধারা ৩৩
এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যেকোন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

৪.৪.৬ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০

অপরাধ, বিচার ও দণ্ড:

ধারা ১৫
এই আইনের অধীন অপরাধ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভ্রাম্যমান আদালত বা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার হইবে।

এই অধিবেশনে প্রদত্ত বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি এবং বিচারিক ব্যবস্থা নিম্নের টেবিলে তুলে ধরা হলো-

আইন	ধারা	অপরাধ	শাস্তি	আদালত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের	অণুচ্ছেদ নং ১০২	জলাধার সংরক্ষণে এবং প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রিট মামলা দায়ের করা যাইতে পারে।		হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	ধারা ৬ঙ	জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করা।	সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড বা ১০ লক্ষ্য টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। (ধারা ১৫)	পরিবেশ আদালতে বা ফৌজদারি আদালত।
বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩	ধারা ২৯(১)	কান ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সুরক্ষা বা প্রতিপালন আদেশ লঙ্ঘন করলে।	সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	ফৌজদারি আদালত।
দণ্ডবিধি, ১৮৬০	ধারা ২৭৭	কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জলাধারের পানি দূষিত বা কলুষিত করে ব্যবহারের অনুপযোগী করে।	সর্বোচ্চ তিন মাস কারাদণ্ড বা ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড ।	ফৌজদারি আদালত।
মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০	ধারা ৩	ধারা তিন এর অধিনে বর্ণিত কোন নিষিদ্ধ কার্যক্রম করলে।	সর্বনিম্ন ১ বছর অথবা সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড বা ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।
মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০	ধারা ৪ক	সকল প্রকার কারেন্টজাল উৎপাদন, বুনন, আমদানি, গুদামজাতকরণ, বহন, পরিবহন ও নিজের আয়ত্তে রাখা।	৩-৫ বছর কারাদণ্ড ও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হইয়াছে। কারেন্ট জাল বহন পরিবহন নিজ আয়ত্তে রাখা ও ব্যবহারের জন্য ১-৩ বছরের কারাদণ্ড অথবা ৫,০০০(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানার	মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

আইন	ধারা	অপরাধ	শাস্তি	আদালত
			বিধান রয়েছে।	
মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৮৫	বিধি ৩	কোন ব্যক্তি নদী-নালা খাল ও বিলে স্থিরকৃত ইঞ্জিন ব্যবহার বা স্থাপন নির্মাণ বা ব্যবহার করে মাছ ধরলে।	নিয়ম অমান্য করে মাছ ধরা হলে ধৃত মাছ আটক, অপসারণ এবং বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।	মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।
মেরিন ফিশারিজ অর্ডিনেন্স, ১৯৮৩	ধারা ২৬	মৎস্য নিধন বা সহজে মাছ ধরবার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক, বিষ ও অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রব্য প্রয়োগ বা প্রয়োগের উদ্যোগ বা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে উক্ত দ্রব্য বহন বা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্ধারিত নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা বা নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম নৌযানে রাখা।	সর্বোচ্চ এক লক্ষ জরিমানা বা নিষিদ্ধ উপায়ে আহরিত মৎস্যের ১৫ গুণ এই দুইয়ের মধ্যে যা বেশি সেই অংকের টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	ফৌজদারি আদালত।
মেরিন ফিশারিজ অর্ডিনেন্স, ১৯৮৩	ধারা ২৯	সামুদ্রিক রিজার্ভে অনুমতি ছাড়া মাছ শিকার করে বা তৎমর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করে; অথবা ড্রেজিং করে, বালি ও কাঁকড় নিষ্কাশন করে, বর্জ্য পদার্থ বা অন্য কোন দূষিত পদার্থ নিক্ষেপ করে বা জমা করে অথবা অন্য কোনভাবে মাছ বা মাছের প্রজনন ক্ষেত্র বা আবাসস্থলের ব্যাঘাত ঘটায়, পরিবর্তন বা ধ্বংস করে; অথবা উক্ত রিজার্ভমুক্ত কোন ভূমি বা জলাশয়ে বিল্ডিং বা অন্য কোন গৃহাদি নির্মাণ বা উত্তোলন করে।	অনধিক এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।	ফৌজদারি আদালত।

পঞ্চম অধিবেশন	সহ-ব্যবস্থাপনা এবং গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা : আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ সহ-ব্যবস্থাপনা এবং গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

উপকরন ঃ হ্যান্ডআউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার পেন, পোস্টার, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন।

সময় ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ

প্রশিক্ষক এই অধিবেশনে-

- প্রথমে সহ-ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে ওই এলাকার সহ- ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত আঞ্চলিক সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করবেন;
- এরপর চিহ্নিত আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতি সমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরবেন এবং আলোচনা করবেন;
- আইন, বিধি ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ /প্রতিষ্ঠানসমূহ, তাদের কাঠামো ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দিবেন;
- এবং আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি সমূহ ভঙ্গ হলে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা, ক্ষতিগ্রস্থের জন্য প্রতিকার ও দোষী ব্যক্তির জন্য শাস্তি বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন ।

৫.১ সহ-ব্যবস্থাপনা ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করিতে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক সম্পদের কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারিত হইয়াছে। কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থাগুলো নতুন ধারায় কাজ করে যাচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায়। কমিউনিটির অংশগ্রহণে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সরকারের জন্য বর্তমানে আশীর্বাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে এ কমিউনিটি বর্তমানে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে নিজস্ব প্রয়োজনে। প্রশিক্ষণার্থীদের এ সংক্রান্ত যে আইনি বিধান আছে তার ধারণা প্রদান করাই এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য। প্রথমেই প্রাকৃতিক সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনা ও গোষ্ঠীভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- **সহ-ব্যবস্থাপনা**

"সহ-ব্যবস্থাপনা" অর্থ কোন একটি এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বুঝায় বৃহত্তর অর্থে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারী দলের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা করার নাম সহ-ব্যবস্থাপনা। মূলত চারটি

মূল ভিত্তির উপর সহ-ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে-১) সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি; ২) কমিউনিটিকে ক্ষমতায়ন; ৩) কমিউনিটির সাথে সরকারের একটা সুসম্পর্ক স্থাপন; এবং ৪) আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি। এদেশে মূলত বনাঞ্চল এবং জলভাগের রক্ষিত এলাকা এ ব্যবস্থাপনার আওতাধীন (IUCN, 2010)।

- *সহ-ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা:*

ধারা ২(৩৮)

২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের ধারা ২(৩৮)-এ বলা হইয়াছে "সহ-ব্যবস্থাপনা" অর্থ কোন একটি এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বুঝায়।

- **কমিউনিটিভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা**

লোকজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট কোন কমিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা করাই মূলত কমিউনিটিভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা। এ ব্যবস্থাপনার দ্বারা লব্ধ আয়ে কমিউনিটির অধিক প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৫.২ সহ-*ব্যবস্থাপনা* ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: আইন, নীতি ও কেইস স্টাডি

৫.২.১ সাংবিধানিক বিধানাবলি

সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে সমবায় ও ব্যক্তির মালিকানা স্বীকার করা হইয়াছে। এ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে– উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এ উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে: -

ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র নিয়ে সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

খ) সমবায় মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং

গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে। এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এবং সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

- **প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত সম্পত্তি**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোনো ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত সম্পত্তিসমূহ প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে:

(ক) বাংলাদেশের যে কোনো ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী;

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং

(গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকবিহীন যে কোনো সম্পত্তি।

৫.২.২ গ্রাম বন

বন আইন, ১৯২৭-এ স্পষ্টভাবে জণগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে। এ আইনের ২৮ ধারায় গ্রামবন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের কথা বলা হইয়াছে। এ ধারায় বলা হইয়াছে সরকার যে কোন সংরক্ষিত বনে তার অধিকার যে কোন গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করিতে পারে এবং তা বাতিল করিতে পারে এ জাতীয় সকল বন ভিলেজ ফরেস্ট বা গ্রাম বন নামে পরিচিত হইবে। গ্রাম বনের ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারে। বিধিতে কোন শর্তের অধীনে গ্রামীণ সম্প্রদায় কাঠ বা অন্যান্য বনজ দ্রব্য পাইবে কিংবা গোচারণের অধিকার পাইবে তা নির্ধারণ করা থাকিবে। একই সাথে বন রক্ষা এবং উন্নয়নে সম্প্রদায়ের কর্তব্যও বিধিতে নির্ধারণ করা থাকিবে। এ বিধান ১৯২৭ সাল থেকে বহাল থাকলেও অদ্যাবধি এর বাস্তবায়ন হয়নি। হয়নি কোন গ্রাম বন বিধিমালা।

৫.২.৩ সামাজিক বনায়ন

২০০০ সালে বন আইন, ১৯২৭ এর সংশোধনী এনে ২৮ক, ২৮খ ধারা সংযোজন করা হয় এবং সামাজিক বনায়নের বিধান চালু করা হয়। এ ধারার ক্ষমতা বলে সরকার ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রণয়ন করে এবং ২০১০ সালে এর সংশোধনী আনে। এ বিধিমালার গুরত্বপূর্ণ কিছু বিধান নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- **স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের পদ্ধতি**

বিধি ৫ক

(১) সামাজিক বনায়নের উপযোগী কোন ভূমিতে বনায়নে আগ্রহী স্থানীয় জনগোষ্ঠী বন বিভাগের বিট রেঞ্জ কার্যালয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট 'ফরম ক' তে লিখিত আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উপকারভোগী চিহ্নিত করিতে এবং উপকারভোগীগণকে বনায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে সহায়তা প্রদানের জন্য, ফরেস্ট রেঞ্জারের নীচে নহে এইরূপ, একজন বন কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন।

(৩) বন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং আবেদনকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যূনতম দুইজন প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে অন্তত একজন মহিলা থাকিবেন, সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) অনুযায়ী উপকারভোগীদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্ত হইবার পর সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট 'ফরম খ'তে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নিম্নলিখিত বিষয়াবলি যাচাই করিবেনঃ -

(ক) বনের সহিত নির্বাচিত উপকারভোগীদের সম্পর্ক এবং

(খ) বনায়ন কার্যক্রমে শ্রম বিনিয়োগের প্রদানের সামর্থ্য

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন যাচাইয়ের পর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সামাজিক বনায়নের লক্ষ্যে, বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১ক) এর বিধান অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচনের চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৭) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১ক) এর অধীন উপকারভোগী নির্বাচনের পর এবং বিধি ৪ এর অধীন চুক্তি স্বাক্ষরের পর, বিভাগীয় বন কমকর্তা, নির্বাচিত উপকারভোগী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে 'ফরম গ' তে সামাজিক বনায়নের অনুমতি প্রদান করিবেন।

- *উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি*

বিধি ৬

(১) উপকারভোগীগণ বন অধিদপ্তর কর্তৃক, সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত বনায়নের সহিত সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে, নির্বাচিত হইবেন।

(১ক) উপ-বিধি (১) এ যাহা থাকুক না কেন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি উপকারভোগী নির্বাচন চূড়ান্ত করিবেন।

(২) সাধারণভাবে কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার এক বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্য হইতে উক্ত এলাকার উপকারভোগী নির্বাচিত হইবেন এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উপকারভোগী নির্বাচনে অগ্রাধিকার পাইবেন, যথা :-

(ক) ভূমিহীন;
(খ) ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক;
(গ) দুস্থ মহিলা;
(ঘ) অনগ্রসর গোষ্ঠী;
(ঙ) দরিদ্র আদিবাসী;
(চ) দরিদ্র ফরেস্ট ভিলেজার; এবং
(ছ) অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা অথবা মুক্তিযোদ্ধার অস্বচ্ছল সন্তান।

(৩) কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপকারভোগী না পাওয়া গেলে উক্ত এলাকার নিকটতম এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীগণের মধ্যে হইতে উপকারভোগী নির্বাচন করা যাইবে।

(৪) নির্বাচিত উপকারভোগীকে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করিতে আগ্রহী হইতে হইবে।

- ***সামাজিক বনায়ন হইতে লব্ধ আয়ের বণ্টন***

বিধি ২০

(১) যুক্তিসঙ্গত কারণে ছাঁটাইকৃত ডালপালা, প্রথম ঘনত্ব হ্রাসকরণকালে কর্তিত বৃক্ষ, ফলজ বৃক্ষের ফল এবং উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল সম্পূর্ণ উপকারভোগীগণ প্রাপ্য হইবেন।

(২) প্রথম ঘনত্ব হ্রাসকরণ এর পরবর্তী সকল ঘনত্ব হ্রাসকরণকালে এবং আবর্তকাল পূর্ণ হইবার পর কর্তিত বৃক্ষ হইতে লব্ধ আয় বিভিন্ন পক্ষগণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত হারে বণ্টিত হইবে, যথা-

(ক) বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বন ভূমির উডলট ও কৃষি বনের ক্ষেত্রে:

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(১) বন অধিদপ্তর	৪৫%
(২) উপকারভোগীগণ	৪৫%
(৩) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(খ) বন অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অথবা সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানা বা দখলি স্বত্বাধীন সংকীর্ণ ভূমিতে (স্ট্রিপ) বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রেঃ-

<u>পক্ষ</u>	<u>প্রাপ্য হার</u>
(১) বন অধিদপ্তর	১০%
(২) ভূমির মালিকানা বা দখলিস্বত্ত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা	২০%
(৩) উপকারভোগীগণ	৫৫%
(৪) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ	০৫%
(৫) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(গ) চরভূমি ও ফোরশোর বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে :

<u>পক্ষ</u>	<u>প্রাপ্য হার</u>
(১) বন অধিদপ্তর	২৫%
(২) উপকারভোগীগণ	৪৫%
(৩) ভূমির মালিক বা দখলদার	২০%
(৪) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(ঘ) শালবন ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেঃ

<u>পক্ষ</u>	<u>প্রাপ্য হার</u>
(১) বন অধিদপ্তর	৬৫%
(২) উপকারভোগীগণ	২৫%
(৩) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(ঙ) বরেন্দ্র এলাকায় খাঁড়ি ও পুকুর পাড় পুনর্বাসন ও বনায়নের ক্ষেত্রে-

<u>পক্ষ</u>	<u>প্রাপ্য হার</u>
(১) বন অধিদপ্তর	২৫%
(২) উপকারভোগীগণ	৪৫%
(৩) ভূমির মালিক বা দখলকার	৩৫%
(৪) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(চ) শালবন ব্যতীত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে-

<u>পক্ষ</u>	<u>প্রাপ্য হার</u>
(১) বন অধিদপ্তর	৫০%
(২) উপকারভোগী	৪০%
(৩) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(ছ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে

<u>পক্ষ</u>	<u>প্রাপ্য হার</u>
(১) বন অধিদপ্তর	২৫%
(২) উপকারভোগী	৭৫%

(জ) **স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে-**

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(১) বন অধিদপ্তর	১০%
(২) উপকারভোগীগণ	৭৫%
(৩) ভূমির মালিক সংস্থা	১৫%

৫.২.৪ *বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২*

এ আইনে সহ-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধান রাখা হইয়াছে। স্থানীয়দের অংশগ্রহণে রক্ষিত বন ব্যবস্থাপনার বিধানও রাখা হইয়াছে এ আইনটিতে। এ আইনের কমিউনিটি ভিত্তিক ও সহব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- **অভয়ারণ্য ঘোষণা**

ধারা ১৩(৩)

কোন জলাভূমিকে অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হইলে উক্ত এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী, যেমন- জেলে, নৌকাচালক ইত্যাদি পেশাগত, প্রথাগত বা জীবন জীবিকার অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ।

- **কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা ঘোষণা**

ধারা ১৮ (১)

ল্যান্ডস্কেপ জোনের অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ কোন জমি বা জলাভূমির মালিক কোন ব্যক্তি বা কমিউনিটি কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ এর প্রথাগত অথবা কৃষ্টিগত মূল্যবোধ বা ব্যবহার সংরক্ষণ এবং উক্ত জমি বা জলাভূমির টেকসই উন্নয়ন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা হিসাবে ঘোষণার লক্ষ্যে সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে ।

ধারা ১৮ (২)

উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন করা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আবেদনে উল্লিখিত জমি বা জলাভূমিকে কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে ।

ধারা ১৮(৩)

উপ-ধারা (২) এর অধীন ঘোষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করিতে পারিবে এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

ধারা ১৮(৪)

উপ-ধারা (২) এর অধীন ঘোষিত এলাকার কোন ক্ষতিগ্রস্ত মালিককে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবে।

- **সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি**

ধারা ২১ (১):
সরকার অভয়ারণ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তর, বনাঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনসাধারণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করিতে পারিবে।

ধারা ২১ (২)
উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিতে এবং উক্ত কমিটির কার্যপরিধিও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

- ***জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ এবং কুঞ্জবন ঘোষণা***

ধারা ২৩(১)
সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি বন, কোন সংস্থার অধীন ভূমি, খাস জমি বা কমিউনিটির মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষ বা কুঞ্জবন যাহা সাংস্কৃতিক, প্রথাগত, ধর্মীয় বা স্মৃতিস্মারক হিসাবে চিহ্নিত ও ব্যবহৃত এবং যাহা বিভিন্ন ধরণের বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হিসাবে উক্ত এলাকায় পরিচিত তাহা উক্ত ভূমির মালিক, সংস্থা বা ব্যক্তির আবেদনক্রমে, জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ, বা ক্ষেত্রমতে, কুঞ্জবন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে । তবে শর্ত থাকে যে, কমিউনিটি বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহাদের প্রথাগত বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং অনুশাসন সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৫.২.৫ বনাঞ্চল সহ-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, ২০০৯ (প্রজ্ঞাপন নং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮)

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন বিভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভূভাগ ও জলভাগের রক্ষিত এলাকা সমূহ যৌথভাবে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার আওতাধীন হইবে এবং উল্লেখিত রক্ষিত এলাকা সমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হইবে। স্থানীয় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে রক্ষিত এলাকা সমূহের উৎপাদন/পণ্য ও সেবা ভোগের সুযোগ সৃষ্টি ও সুষম বন্টনের ব্যবস্থা থাকায় উল্লেখিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-System) টেকসই হইবে। রক্ষিত ও তৎসংলগ্ন এলাকার (Landscape) অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের উন্নয়নে অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন/পণ্য ও সেবা বণ্টন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতামূলক ও সুশাসনের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ও আশেপাশের মূল স্টেকহোল্ডারদের (Stakeholders) পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার্থে নিম্নোক্ত ভাবে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হলো।

- **সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council)**

অনুচ্ছেদ ২:

মাননীয় সংসদ সদস্য	- উপদেষ্টা
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যন	- উপদেষ্টা
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	- উপদেষ্টা

(ক) সুশীল সমাজঃ

স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী
সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা (সর্বোচ্চ) ৫ জন

(খ) স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও সরকার:

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ, এন, ও) ১ জন
সহকারী বন সংরক্ষক ১ জন
সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা ১ জন
সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার/
স্টেশন অফিসার (সর্বোচ্চ) ৫ জন
পুলিশের বিভাগের প্রতিনিধি ১ জন
পার্শ্ববর্তী ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার ১ জন
বি,ডি,আর/কোস্ট গার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ১ জন
রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ৫ জন
(ন্যূনতম দুই জন মহিলা এবং এক জন পুরুষ সদস্যসহ)

(গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠী :

বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ৪ জন
স্থানীয় নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ৩ জন
বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি ৫ জন
কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপের প্রতিনিধি ৫ জন
পিপলস ফোরাম/সম্পদ ব্যবহারকারী ফেডারেশন প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ২২ জন

রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের স্থানীয় গ্রাম সমূহের সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে পিপলস ফোরাম গঠিত হইবে। গ্রামের অধিবাসীগণ পিপলস ফোরামের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। এ ক্ষেত্রে পিপলস ফোরামের ৩৩% সদস্য হতে হইবে মহিলা।

(ঘ) অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ৫ জন

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- মৎস্য অধিদপ্তর
- পরিবেশ অধিদপ্তর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- সমাজ সেবা অধিদপ্তর

অনুচ্ছেদ ২.১

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রক্ষিত এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুইবার সভায় মিলিত হইবে। সদস্য সচিব সভা আহবান করিবেন। প্রয়োজনে সদস্য সচিব ৭ দিনের নোটিসে সভা আহবান করিতে পারিবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সর্বোচ্চ ৬৫ জন সদস্য থাকিবে। তারমধ্যে ন্যূনতম ১৫ জন মহিলা সদস্য থাকিবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল চার বছরের জন্য নির্বাচিত হইবে। প্রতি চার বছরে নির্বাচনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কাউন্সিল গঠিত হইবে। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকিবেন।

- **সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (Co-management Council) কার্যপরিধিঃ**

অনুচ্ছেদ ২.২

ক. স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহন এবং কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা;
খ. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা;
গ. রক্ষিত ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা;
ঘ. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
ঙ. রক্ষিত এলাকা হতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীদারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নীতি নির্ধারণ ও পরামর্শ প্রদান করা;
চ. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কিংবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন দ্বন্দ্ব বা বিবাদ দেখা দিলে তা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা;
ছ. সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করা;
জ. বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠান করা।

চিত্রঃ সহ-ব্যবস্থাপনা কউন্সিলের গঠন প্রক্রিয়া ও কাঠামো।

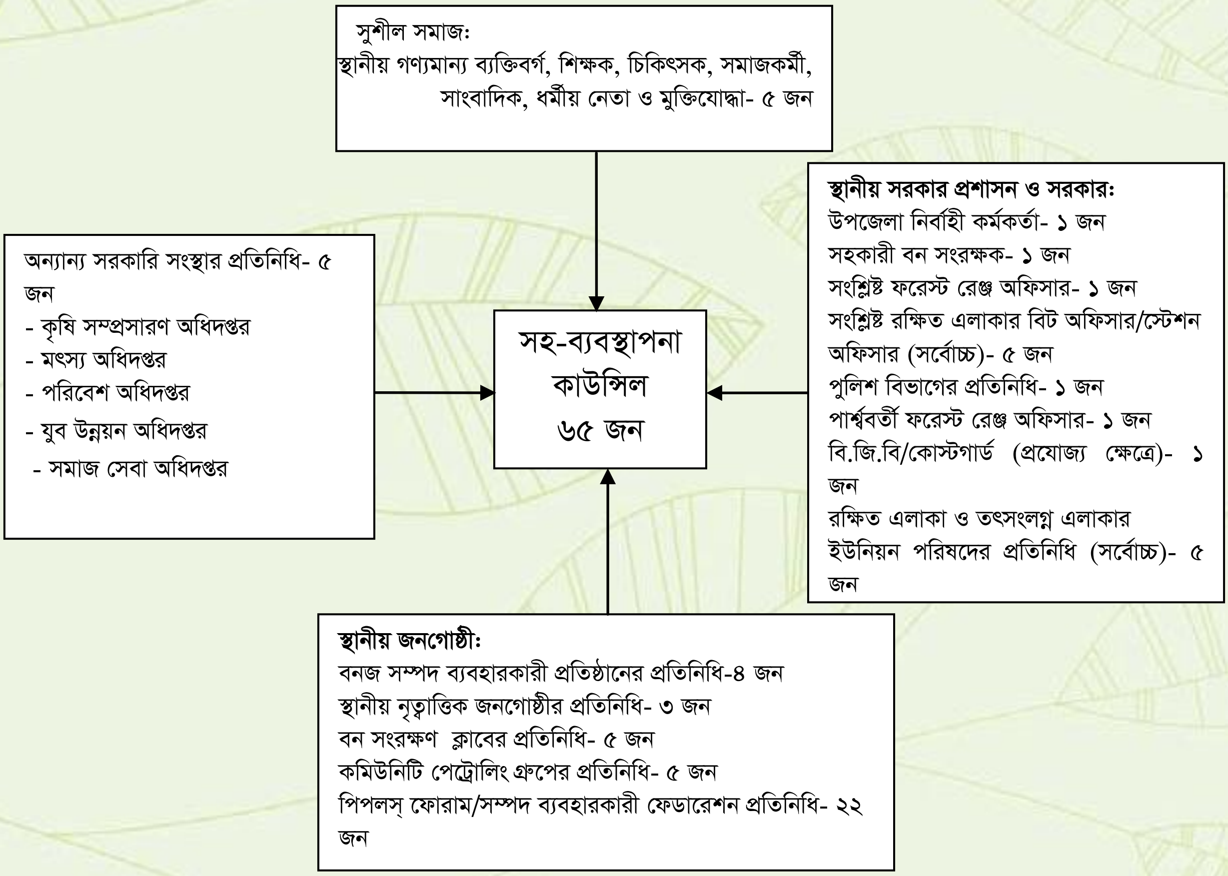

(তথ্যসূত্র: প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- জীববিচিত্র্য সংরক্ষনের জন্য রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা, নিসর্গ প্রকল্প, ২০১২)

- **সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co-management Committee):**

অনুচ্ছেদ ৩.০

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ, এন, ও) উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
সদস্য:
সহকারী বন সংরক্ষক ১ জন (পদাধিকারবলে)
সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা (সদস্য সচিব) ১ জন (পদাধিকারবলে)
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ২ জন
(একজন অবশ্যই মহিলা হইবেন)
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ২ জন
পিপলস ফোরামের প্রতিনিধি ৬ জন
বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি ২ জন
বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ১ জন
নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিনিধি ২ জন
কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপের প্রতিনিধি ৩ জন
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২ জন
(পুলিশ, বি.ডি.আর, কোস্ট গার্ড)
সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ১ জন
সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার/স্টেশন অফিসার (সর্বোচ্চ) ৫ জন
পার্শ্ববর্তী রেঞ্জ অফিসারগণ - ১ জন
সদস্যদের মধ্যে ন্যূনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ৩.১

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপসমূহ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে;
পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্যগণ ছাড়া সকল সদস্যই ২ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন;
কোন ব্যক্তিই একাধিকক্রমে দুইবারের বেশি মেয়াদের জন্য কমিটির সদস্য হতে পারিবেন না;
সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত করিবেন; কমিটির হিসাবাদি সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে; বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবেন।

অনুচ্ছেদ ৩.১.০

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি নিজস্ব অফিস থাকিবে যা যথাসম্ভব বন অফিসের কাছাকাছি হতে হইবে। এ লক্ষ্যে একজন পূর্ণকালীন হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকিবে। উক্ত কর্মকর্তা কমিটির আর্থিক ও অন্যান্য রেকর্ডাদি সংরক্ষণ করিবে। উপদেষ্টাগণের দিক-নির্দেশনামতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন প্রতি বছর অডিট করাতে হইবে। হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার কার্যাবলির জন্য সদস্য-সচিবের নিকট দায়ী থাকিবে। তার বেতনাদি কমিটির নিজস্ব তহবিল হতে বহন করা হইবে। সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সদস্য-সচিব সভা আহবান করিবেন এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ৩.১.১

হিসাব রক্ষক-কাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ অন্যান্য নিয়োগের নিয়োগবিধি ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলাবিধি সহ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ৩.১.২

কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৯ জন হইবে।

অনুচ্ছেদ ৩.১.৩

কমিটির সদস্যগণ মাসে ন্যূনতম ১ (এক) বার সভায় মিলিত হইবেন। সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিতি সভার কোরাম হিসাবে গণ্য করা হইবে।

- **সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি :**

অনুচ্ছেদ ৩.২

ক. রক্ষিত এলাকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা;

খ. রক্ষিত এলাকার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পরিকল্পিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল Mobilization এর ব্যবস্থা করা;

গ. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা;

ঘ. সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় চুক্তির মাধ্যমে কোন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলকভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করা;

ঙ. রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় (Landscape) বন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনায় পিপলস ফোরামের সহোযোগিতায় রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা;

চ. রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় রাজস্ব আহরণ ও অর্থায়ন ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ছ. রক্ষিত এলাকায় বন বিভাগ সহ স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিতদের মধ্যে পণ্য, সেবা ও সুফল যৌক্তিকভাবে বণ্টন এবং টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

জ. ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ভূমি জোনিং (Zoning) কার্যক্রম এবং হেবিটেট (Habitat) পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে রক্ষিত এলাকা ও ল্যাণ্ডস্কেপ জোনে যথাযথ বিবেচনার্থে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

ঝ. রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণে বন বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে পিপলস ফোরামের সমর্থনমূলে পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা গ্রহন করা;

ঞ. রক্ষিত এলাকা কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও টেকসই করার নিমিত্তে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ ও তা রক্ষিত এলাকায় ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বণ্টন নিশ্চিত করা;

ট. সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসনে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা;

ঠ. সরকার অনুমোদিত নির্দেশিকা মতে এন্ট্রি ফি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষনে যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করা;

ড. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের প্রতিটি সভায় উপস্থাপনা করা;

ঢ. পিপলস ফোরামের সহযোগীতাক্রমে ছাত্রদের ডরমিটরি, দর্শকদের সুবিধাদিসহ কমিউনিটির সম্পত্তি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ণ. বাফার জোনে (Buffer Zone) বাগান সৃজন ও সৃজিত বনের সুফল অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি ও পদ্ধতি মতে বন্টন, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা।

ত. রক্ষিত এলাকার বা কোন এলাকার বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

থ. বাফার জোনে (Buffer Zone) বাগান সৃজনে অংশীদার নির্বাচনে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করা।

দ. এ কমিটি সকল কার্যক্রমের জন্য পিপলস ফোরাম এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকিবে।

চিত্রঃ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন কাঠামো

(তথ্যসূত্র: প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের জন্য রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা, নিসর্গ প্রকল্প, ২০১২)

৫.২.৬ বন নীতি ১৯৯৪

দেশের বন সম্পদের অস্বাভাবিক ও দ্রুত অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে পরিবেশের অবনতিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও অনাকাঙ্কিত প্রতিকূলতা মোকাবিলার লক্ষ্যে প্রণীত বন আইনেও অংশীদারিত্বমূলক বা কমিউনিটির মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ তুলে ধরা হলো-

১। বনখাত হইতে এমন বেশ কিছু পণ্য সামগ্রী ও সেবা পাওয়া যায় যাহা জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অত্যাবশ্যক। বাড়িঘর, নৌকা ইত্যাদি তৈরির জন্য কাঠ, রান্নাবান্নার কাজের জন্য জ্বালানি কাঠ, গবাদি পশুর খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য ঔষধ জাতীয় লতাপাতা, গুল্ম ও ফলমুল এবং মৃত্তিকা আবরণী, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সেবা সহযোগিতা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হইবে (বন খাত উন্নয়নের পূর্বশর্ত ১)।

২। বনখাতের উন্নয়নের সুফলসমূহ জনগণের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করিতে হইবে এবং বিশেষ করিয়া যাহাদের জীবন-জীবিকা বৃক্ষ বন ও বনভূমির উপর নির্ভরশীল, তাহাদেরকে এ খাতের উপকার ও সুফল প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে (বন খাত উন্নয়নের পূর্বশর্ত ২)।

৩। বন খাতের উন্নয়নে বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মহিলাসহ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পক্রিয়ায় বৃক্ষচাষি বন ব্যবহারকারী এবং যাহাদের জীবিকা বন ও বনভূমির উপর নির্ভরশীল তাহাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে (বন খাত উন্নয়নের পূর্বশর্ত ৩)।

৪। বনজ এবং বৃক্ষ সম্পদের সুষ্ঠু ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা উল্লিখিত সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতাকে সংরক্ষণ পূর্বক ইহার সদ্ব্যবহার এবং জৈব পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে, যাহাতে এই সম্পদ গ্রামীণ ও জাতীয় উন্নয়নে ফলপ্রসু অবদান রাখিতে পারে (বন খাত উন্নয়নের পূর্বশর্ত ৫)।

৫.২.৭ জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশলগত কর্ম-পরিকল্পনা, ২০০৪

জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশলগত কর্ম-পরিকল্পনা, ২০০৪-এ সহ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী সহ-ব্যবস্থাপনা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কর্তৃত্ব, দায়িত্ব ও লভ্যাংশ স্থানীয় কমিউনিটি এবং সরকারের মধ্যে ভাগাভাগি করা।

- ***সমাজভিত্তিক জলাভূমি ব্যবস্থাপনা/কমিউনিটি ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা***

সমাজভিত্তিক জলাভূমি ব্যবস্থাপনা/কমিউনিটি ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়টি বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সফলতা লাভ করেছে। এ সফলতা থেকেই কমিউনিটিভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা অন্যান্য সম্পদ যেমন: পানি, বন ও দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ইত্যাদির মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০-এ কমিউনিটিভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন বিধান নেই। তবে ভূমি সংক্রান্ত কিছু আইনে হালকাভাবে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি চলে এসেছে জলাভূমি লিজ সংক্রান্ত বিষয়ে। কমিউনিটির অংশগ্রহণে জলাভূমি ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশনা প্রস্তুতের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ২০০৯ সালের সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিয়েছে।

কেইস স্টাডি-৬
মৎস্যজীবীদের মাধ্যমে জলাশয় ব্যবস্থাপনা

সরকার দেশের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সংগঠিত ও সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন সময়ে নানামূখী প্রকল্পের আওতায় বেশকিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম একটি প্রকল্প ছিল Management of Aquatic Ecosystem through Community Husbandry [MACH] যার উদ্দেশ্য ছিল সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত তালিকাভুক্ত জলমহালে মৎস্য সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে জলাভূমির সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ সংরক্ষিত অভয়াশ্রম গড়ে তোলা। ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী তালিকাভুক্ত জলমহাল মৎস্যজীবী সংগঠন এবং মৎস্যজীবী পেশার সাথে জড়িত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাবের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে গঠিত "উপজেলা মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কমিটি" নামক ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে প্রতিবছর ৩০শে চৈত্রের মধ্যে ইজারা প্রদান করবে। ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে জলমহালসমূহ আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্তে দ্বিতীয় পক্ষ মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ১০ বছরের জন্য ন্যস্ত করবে এবং প্রয়োজনে নবায়ন করতে পারবে। তাছাড়া সমঝোতা স্মারকের ৯ নং শর্ত মোতাবেক ভূমি মন্ত্রনালয় (১ম পক্ষ) উন্নয়ন পরিকল্পনাধীন জলমহাল ১০ বছরের জন্য লিজ দিতে সম্মত হয়। তবে বর্তমান নীতি অনুসারে একসঙ্গে ৫ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হইবে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে, প্রথম ৫ বছরের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও তার ফলাফল বিবেচনা করে যদি যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকৃত হয় তাহলেই কেবল লিজ গ্রহীতা (২য় পক্ষ) কে আরও ৫ বছরের জন্য এবং পরবর্তীতে একই পদ্ধতিতে লিজ দেওয়া হবে যা বাস্তবায়িত হয়েছে। স্বাক্ষরিত সমঝোতা শর্তানুযায়ী হস্তান্তরিত জলমহালসমূহের প্রযুক্তিভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয়ে মনিটর করার জন্য যুগ্ম সচিব (প্রঃ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী হস্তান্তরিত জলমহালসমূহের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সেগুলোর নবায়ন/পুনঃন্যস্তকরণের মতামত প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সমঝোতা স্মারকের শর্ত অনুযায়ী যুগ্ম সচিব (প্রঃ), ভূমি মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক পুনরায় নবায়ন বিষয়ে যুক্তিসংগত মতামত প্রদানের পূর্বে এবং মতামত গ্রহণ ব্যতিরেকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান করে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন, যার স্মারক নং ৯৩১.০০০.০০২.০৪.০০.০০৩.২০০৮/৯৬৬ তারিখ ০৮-১২-২০১০ যা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ৮.১২.২০১১ তারিখে স্বাক্ষরিত। উক্ত স্মারকের মাধ্যমে শ্রীমঙ্গল উপজেলার মাচ প্রকল্পের আওতাধীন সানন্দা কোচের খাল ও দক্ষিণের খেও, পাত্রডোবা বিল, ধলিডোবা বিল, চাবু ডোবা বিল ও চাতলা ডোবা বিল, লাতুয়া মেট্রা ও কানাকাটা বিল, জেঠুয়া বিল, উদগাই বিল, বড়গাঙ্গিনা, বড়গাঙ্গিনা (বারকান্দি), বাল্লা বিল, দিগুলিয়া বিল ও দিগুলী নদী, আলনী বেরী নালের ডোবা বিল, চাপড়া মাগুরা ও যাদুরিয়া বিল (বাইক্কা বিল), ডুমের বিল জলমহালসমূহের হস্তান্তর/লিজ প্রদানের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। সমঝোতা স্মারকের শর্ত বাস্তবায়ন এবং দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জীবীকা অর্জনের জন্য পথ সুগম রাখার জন্য এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আরএমও কর্তৃক ব্যবস্থাধীন জলমহাগুলির মেয়াদ ৫ বছর বৃদ্ধির জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীমঙ্গল এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মৌলভীবাজার জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সুপারিশ করেন। সে কারনে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার জলমহালগুলো ইজারা বিজ্ঞপ্তি থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে ২৮-১২-২০১১ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ জানান। শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন উল্লেখিত জলমহালগুলো মৎস্যজীবীদের সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বড়গাঙ্গিনা আরএমও'র আওতায় বাইক্কা বিল পরিদর্শন করে আরএমও কর্তৃক জলাশয়টির সঠিক ব্যবস্থাপনার স্বপক্ষে লিখিত প্রতিবেদনও প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী দরিদ্র মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির মূল্যায়নের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিত কোন প্রকল্পভূক্ত জলমহাল কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে প্রকল্পভূক্ত জলমহালসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যার্পিত হইবে। বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী এই প্রকল্পের জলমহালগুলি মূল্যায়ন না করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জলমহালগুলি ব্যবস্থাপনার জন্য দরপত্র আহবান করেন যা সংবিধান, সমঝোতা স্মারক এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতির পরিপন্থি। সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা ও মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণে জলমহালসমূহের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট মামরা দায়ের করে। মামলার প্রেক্ষিতে আদালত নবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত দরপত্র প্রদানের উপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং মৎস্যজীবীদের অনুকূলে লিজ সময় বর্ধনের নির্দেশ প্রদান করে। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে।

তথ্যসূত্র: কেইসটি বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) দায়েরকৃত রিট মামলা থেকে সংগৃহীত

৫.২.৯. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২)

এ নীতির প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে দেশের খাস জলাশয় ও জলামহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনূকুলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ করেছে । এ নীতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন এবং জলমহাল-এর নিম্নরূপ সংজ্ঞাও প্রদান করা হইয়াছে-

- **প্রকৃত মৎস্যজীবী**

নীতি ২ক

যিনি প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ শিকার ও বিক্রয় করে প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করেন তাকেই প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গন্য হইবেন।

- **মৎস্যজীবী সংগঠন**

নীতি ২খ

- প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হইবে না। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করিতে পারিবেন না।

- **জলমহাল**

নীতি ২গ

জলমহাল এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাঁওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দিঘি, খাল, নদী সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমন জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকিবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকিবে না।

- **সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে জলমহাল ব্যবস্থাপনা**

নীতি ৩

২০০৯ সালের জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে জলমহাল অন্য মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর হতে পারে এবং তাদের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা হতে পারে। বর্তমান অবস্থায় বেশ কিছু জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয় হতে হস্তান্তরিত হয়ে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ অন্যন্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হইয়াছে। উল্লেখিত জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনা সমঝোতা স্মারকের আলোকে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনা করিবেন। উল্লেখ্য বিভিন্ন মন্ত্রাণালয়ে হস্তান্তরিত জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দফতর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

- **জাল যার জলা তার নীতি**

নীতি ৫

জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ এ 'জাল যার জলা তার' নীতির আলোকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে, জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সেই সকল সমিতি উল্লেখিত জলমহাল ইজারা বা ব্যবস্থাপনা করার জন্য আবেদন করিতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত সমিতিতে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে কোন সদস্য থাকলে ইজারার জন্য আবেদন করিতে পারিবে না। ২০ একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহালসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সমঝোতার ভিত্তিতে ৩ বছর মেয়াদে স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমিতিকে বন্দোবস্ত দিতে পারিবে।

- **প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মাধ্যমে মৎস্য ব্যবস্থাপনা:**

৫.২.১০ মৎস্য নীতি, ১৯৯৮

মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতিকল্পে প্রণীত জাতীয় মৎস্য নীতিতে অংশীদারিত্বমূলক বা কমিউনিটিভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত নীতিসমূহ তুলে ধরা হলো-

- **অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি**

নীতি ৫.২

মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইজারা প্রথা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের অনুকূলে উৎপাদনভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হইবে ।

নীতি ৫.২.২

মৎস্যজীবী সংগঠন ও স্থানীয় সরকারসমূহের মাধ্যমে চিহ্নিত মৎস্য অভয় আশ্রমসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করিবে। চিহ্নিত জলাশয়সমূহের বরাদ্দ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে।

- **অভ্যন্তরীণ বদ্ধজলাশয়ের মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা নীতি**

নীতি ৬.০

- মৎস্য চাষে মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ ও তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হইবে (নীতি ৬.৩)।
- ভাসমান দরিদ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বিকল্প উপার্জনের উৎসের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে হাওর, বাঁওড় ও সম্ভাব্য অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্য চাষের উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হইবে (নীতি ৬.৪)।
- সরকারি খাস দিঘি, পুকুর কিংবা অন্যান্য জলাশয় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিত্তহীন প্রান্তিক চাষি ও গরিব মৎস্যচাষি, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার যুবক/যুব মহিলা ও লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হইবে। দরপত্র লব্ধ আয়ের অর্থ নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে সরকারি খাতে কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ তহবিলে জমা হইবে (নীতি ৬.৪.১)।
- স্থানীয় মৎস্যজীবী সংগঠনকে বাঁওড়ে মৎস্য চাষের জন্য অগ্রাধিকার প্রদানসহ তাদেরকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হইবে (নীতি ৬.৮.১)।

- **মৎস্য সমবায়:**

দেশের বৃহদায়তন বিশিষ্ট প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম সরকারি খাস জলাশয় সমূহের ব্যবস্থাপনার লক্ষে মৎস্যজীবি ও মৎস্যচাষিদের কে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা নেয়া হইবে। মৎস্য বিষয়ক যে কোন ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান করা হইবে। সরকার খাশ জলাশয় গুলো মৎস্য সমবায়ীদের স্বার্থে দীর্ঘ মেয়াদি বরাদ্দ দেয়ার বাবস্থা করা হইবে।

৫.৩ সহ-ব্যববস্থাপনা ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: ***এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো***

আইন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯	ভূমি মন্ত্রনালয়
মৎস্য রক্ষা এবং সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০	মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়
জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা, ২০০৪	পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বননীতি, ১৯৯৪; বন আইন, ১৯২৭; বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২; সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪	বন বিভাগ ও পরিবেশ ও মন্ত্রণালয়
মৎস্য সংরক্ষণ ও রক্ষা বিধিমালা, ১৯৮৫; মৎস্য নীতি, ১৯৯৮	মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫.৪ সহ-ব্যবস্থাপনাও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা: বিচারিক ব্যবস্থা

প্রশিক্ষণার্থীরা এ অধিবেশনে যে বিধানগুলো জানতে পারলো তার লঙ্ঘন হলে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার করা যেতে পারে। তাছাড়া অধিকার আদায়ের জন্য উচ্চ আদালতে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রিট মামলা করা যেতে পারে।

৫.৪.১ বন আইন ১৯২৭

ধারা ৬৭:

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড বা অনধিক দশ হাজার টাকা পরিমাণ অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড শাস্তিযোগ্য কোন বন অপরাধ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর অধীন সংক্ষিপ্তভাবে বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।

ধারা ৬৭ক:

সরকার, সরকারি গেজেট দ্বারা, এই আইনের অধীন অপরাধ বিচার করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণের এখতিয়ারধীন এলাকা নির্দিস্ট করে দিতে পারিবে। এ ম্যাজিস্ট্রেটগণের আইনের অধীন যে কোন ধরনের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৫.৪.২ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২

ধারা ৪৪:

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচার প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ক্ষেত্রমত, The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ধারা ১২ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বা স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ বিচার্য হইবে। এ আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে। মৎস্য আইনের লঙ্ঘনের বিচারও হইবে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে।

ষষ্ঠ অধিবেশন	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশনের শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা

১. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, নীতি, সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে;

২. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করাই এ অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য।

উপকরণ ঃ হ্যান্ড আউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার পেন, পোস্টার, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন ।

সময় ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ

প্রশিক্ষক এই অধিবেশনে-

- প্রথমে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে ওই এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সাথে সম্পর্কিত আঞ্চলিক সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করবেন;
- এরপর চিহ্নিত আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতি সমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরবেন এবং আলোচনা করবেন;
- আইন, বিধি ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ /প্রতিষ্ঠান সমূহ, তাদের কাঠামো ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দিবেন;
- এবং আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধিসমূহ ভঙ্গ হলে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা, ক্ষতিগ্রস্থের জন্য প্রতিকার ও দোষী ব্যক্তির জন্য শাস্তি বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন ।

৬.১ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্বক ঝুঁকির মধ্যে যে দেশগুলো রয়েছে বাংলাদেশের স্থান তাদের শীর্ষে। এটা বৈজ্ঞানিক এবং কমিউনিটির আলোচনা থেকে স্বীকৃত যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত দেশ। মানব সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত অস্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, প্রতিযোগিতামূলক ও বাজারমুখী উৎপাদন ব্যবস্থায় জীবাশ্ম জ্বালানির যথেচ্ছ ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত আহরণ, ক্রমবর্ধিষ্ণুহারে ভূমি ব্যবহার এবং ব্যাপকহারে বন উজাড় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিকে আরো বৃদ্ধি করেছে।

- **জলবায়ু পরিবর্তন**

কোন অঞ্চলের গড় আবহাওয়া, ঋতুর স্বাভাবিক সময় বা আবহাওয়ার চরম ঘটনাবলির পরিবর্তনই হলো জলবায়ু পরিবর্তন। বিজ্ঞানীদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক চক্র আছে। প্রতি ১১ বছরে, ১৫০০ বছরে, ৯ হাজার বছরে, ২৬ হাজার বছরের চক্রে জলবায়ুর স্বাভাবিক পরিবর্তন হয় (Astrnomical theory of Climate Change, 2010)। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একমাত্র আইন "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২"-এর ধারা ২(৫) এ বলা হইয়াছে "জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change)" অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মে সূর্যকিরণের শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানে দীর্ঘসময়ের বায়ুমণ্ডলের ভৌত উপাদানসমূহের পরিবর্তনের ফলে অথবা মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্মকাণ্ডের দ্বারা উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তন।

- ***জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:***

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান প্রধান নেতিবাচক প্রভাবগুলো হলো-

- তাপমাত্রার পরিবর্তন
- বৃষ্টিপাতের তারতম্য
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি
- গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি
- বন্যা বৃদ্ধি
- খরা বৃদ্ধি

- ***"দুর্যোগ (Disaster) এর সংজ্ঞা***

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর ধারা ২(১১) এ বলা হইয়াছে "দুর্যোগ (Disaster)" অর্থ প্রকৃতি বা মনুষ্যসৃষ্ট অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নিম্নবর্ণিত যে কোন ঘটনা, যাহার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার গবাদি পশু, পাখি ও মৎস্যসহ জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সম্পদ, সম্পত্তি ও পরিবেশের এইরূপ ক্ষতিসাধন করে অথবা এইরূপ মাত্রায় ভোগান্তির সৃষ্টি করে, যাহা মোকাবেলায় ঐ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ, সামর্থ্য ও সক্ষমতা যথেষ্ট নয় এবং যাহা মোকাবেলার জন্য ত্রাণ এবং বাহিরের যে কোন প্রকারের সহায়তা প্রয়োজন হয়, যথা:-

(অ) ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, অস্বাভাবিক জোয়ার, ভূমিকম্প, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, নদীভাঙ্গন, উপকূল ভাঙ্গন, খরা, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা, মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণ, ভবনধস, ভূমিধস, পাহাড়ধস, পাহাড়ী ঢল, শিলাবৃষ্টি, তাপদাহ, শৈত্যপ্রবাহ, দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা, ইত্যাদি;

(আ) বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, জলযান ডুবি, বড় ধরনের ট্রেন ও সড়ক দূর্ঘটনা, রাসায়নিক ও পারমাণবিক তেজক্রিয়তা, জ্বালানি তেল বা গ্যাস নিঃসরণ অথবা গণবিধ্বংসী কোন ঘটনা;

(ই) মহামারী সৃষ্টিকারী ব্যাধি, যেমন প্যান্ডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা, বার্ডফ্লু, এনথ্রাক্স, ডায়রিয়া, কলেরা, ইত্যাদি;

(ঈ) ক্ষতিকর অণুজীব, বিষাক্ত পদার্থ এবং প্রাণসক্রিয় বস্তুর সংক্রমণসহ জৈব উদ্ভূত বা জৈবিক সংক্রামক দ্বারা সংক্রমণ;

(উ) অত্যাবশ্যকীয় সেবা বা দুর্যোগ প্রতিরোধ অবকাঠামোর অকার্যকারিতা বা ক্ষতিসাধন; এবং

(ঊ) ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টিকারী কোন অস্বাভাবিক ঘটনা এবং দৈব দুর্বিপাক।

- **অভিযোজন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা**

  জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর ধারা ২(১৩) এ বলা হইয়াছে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা" অর্থ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়াদানের নিমিত্ত পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম, যাহার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যথাঃ -

  (অ) দুর্যোগের বিপদাপন্নতা, পরিধি, মাত্রা ও সময় নির্ণয়;
  (আ) ব্যবস্থাপনাসহ সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ, সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন;
  (ই) আগাম সতর্কতা, হুঁশিয়ারি, বিপদ বা মহাবিপদ সংকেত প্রদান ও প্রচারের ব্যবস্থা এবং জান-মাল নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর;
  (ঈ) দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও চাহিদা নিরূপণ, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের অধীন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন এবং অত্যাবশ্যকীয় সেবা, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
  (উ) আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা।

৬.২ *জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ আইন, নীতি, কৌশলসমূহ ও কেইস স্টাডি*

৬.২.১ National Adaptation Programme of Action (NAPA), 2005/ ন্যাশনাল এডাপটেশন প্রোগ্রাম অব একশন (নাপা), ২০০৫

জলবায়ু পরিবর্তনকে বাংলাদেশের জন্য সর্বোচ্চ ঝুঁকি বিবেচনা করে এ ঝুঁকি হ্রাস করিতে বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় ২০০৫ সালে ন্যাশনাল এডাপটেশন প্রোগ্রাম অব একশন (নাপা) প্রস্তুত করে। নাপার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো চিহ্নিত করে এবং এ পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের কৌশল তুলে ধরা হয়। নাপা অভিযোজনের জন্য নিম্নরূপ কৌশল সুপারিশ করে-

- কমিউনিটির অংশগ্রহণে উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমানো;
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি মোকাবেলায় উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাবার পানি সরবরাহ করা;
- পানি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকল্পনা, অবকাঠামো নকশা, সংঘাতপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, ভূমি-পানি এলাকা চিহ্নিতকরণে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সম্পৃক্ত করার সামর্থ্য গড়িয়া তোলা;
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা এবং সচেতনতা গড়ে তোলা;
- প্রধান বন্যা প্রবণ এলাকাগুলোতে ঘন ঘন বন্যার পুনরাবৃত্তি পরিস্থিতি মোকাবেলায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, এবং তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্র নির্মাণ করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানি, কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিল্প খাতসমূহের নীতি ও কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে অভিযোজন বিষয়টি মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ;
- মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় শহর এলাকার অবকাঠামো ও শিল্প কারখানাগুলোর সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা;
- অধিক জলবায়ু ঘটিত দুর্যোগের ক্ষেত্রে অভিযোজনের জন্য বিমার সুযোগ-সুবিধা অনুসন্ধান করা;
- লবণাক্ততা বৃদ্ধি মোকাবেলায় উপকূলীয় শস্যজাত কৃষিতে অভিযোজন কর্মসূচি জোরদার;

- ভবিষ্যতে অভিযোজন সুবিধা দিতে খরা, বন্যা, ও লবণাক্ততা সহনশীল শস্যের ওপর গবেষণা করা;
- দেশের উত্তর পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকায় কৃষি ব্যবস্থায় অভিযোজন বাস্তবায়ন;
- অভিযোজন ও বহুমাত্রিক মৎস্য চাষের চর্চার মাধ্যমে দেশের উত্তর পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে বন্যাপ্রবণ এলাকায় মৎস্য ব্যবস্থায় অভিযোজন বাস্তবায়ন; এবং
- বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে বিশেষ করে লবণাক্ততা সহনশীল মাছ চাষের মাধ্যমে উপকূলীয় মৎস্য চাষে অভিযোজন জোরদার করা।

৬.২.২ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯/Bangladeh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009

২০০৮ সালে বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনের ক্ষেত্রে প্রধান নীতিমালা হিসেবে ১০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০০৯ সালে এটি সংশোধন করা হয়। এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিক্রিয়া সমূহ মোকাবেলায় দেশের সক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করা। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক সফলতা আনয়ন এবং দুযোর্গেও ঝুঁকি কমিয়ে আনাই ছিল এ উদ্দেশ্য। ১০ বছর মেয়াদি এ পরিকল্পনায় ছয়টি উদ্দেশ্যের উপর ৪৪ টা কর্মসূচি ও ১৪৫ টি কার্যক্রম রয়েছে। ছয়টি থিমের অধীনে ৩৪ টা তালিকাভুক্ত কর্মসূচি সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে অভিযোজনভিত্তিক। অন্যদিকে প্রশমনের আওতায় ১০ টি কর্মসূচি রয়েছে। উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

- খাদ্য, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা;
- সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
- অবকাঠামোর উন্নয়ন;
- গবেষণা ব্যবস্থাপনা;
- প্রশমন ও স্বল্প কার্বন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ; এবং
- ব্যক্তিগত দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

- **প্রতিষ্ঠান:**

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় পর্যায়ের কমিটি রয়েছে যার ফোকাল পয়েন্ট হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়।

- ***জাতীয় জলবায়ু তহবিল***

বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মকৌশল এবং পরিকল্পনা (BCCSAP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কমাতে অভিযোজন পরিকল্পনাসমূহের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০১০ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ফান্ড (BCCRF) এই দুটি তহবিল গঠন করেন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এই জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর জন্য প্রতিবছর ১০০মিলিয়ন ইউএস ডলার বরাদ্ধ দিয়েছে।

৬.২.৩ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০-এ নিম্নরূপ তিন স্তর বিশিষ্ট বিসিসিটিএফ'র পরিচালনা কাঠামো প্রণীত হইয়াছে -

- বোর্ড অব ট্রাস্টি;
- টেকনিক্যাল কমিটি; এবং
- সাব-টেকনিক্যাল কমিটি।

- *ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন*

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০এর ধারা ৯ (১)এ বলা হইয়াছে ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা: -

(১) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; অর্থ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; কৃষি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; মন্ত্রিপরিষদ সচিব; গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক; সচিব, অর্থ বিভাগ; সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।

এছাড়াও থাকিবেন সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন; সরকার কর্তৃক মনোনীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী এই বোর্ড এর চেয়ারম্যানও হইবেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, সচিব এই বোর্ড এর সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বা গঠিত ইউনিট ট্রাস্টি বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর (ণ) নং ক্রমিকে উল্লেখিত মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) শুধুমাত্র সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ক্রটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

- *ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলি*

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০-এর ধারা ১০-এ বলা হইয়াছে ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা: -

(ক) ট্রাস্টের কার্যক্রম সার্বিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 বাস্তবায়নের জন্য ট্রাস্টের তহবিলের সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি অনুমোদন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মোট তহবিলের সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ এবং জমাকৃত শতকরা ৩৪ ভাগ অর্থ হইতে সুদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচির অনুকূলে ছাড়করণ;

(গ) তহবিলের জমাকৃত অবশিষ্ট শতকরা ৩৪ ভাগ অর্থ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) ট্রাস্টের তহবিলের অর্থে গৃহীতব্য প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নীতিনির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা ও প্রকল্প বা কর্মসূচির চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;

(ঙ) দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থায়ন এবং বাজেট পরিকল্পনা সম্পর্কে কারিগরি কমিটিকে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(চ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিকারের ব্যবহারিক গবেষণা (Action research) পরিচালনায় কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুমোদন;

(ছ) সরকারের অর্থায়ন ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন দাতা দেশ বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ, অর্থায়ন প্রাপ্তির উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) সামগ্রিক মূল্যায়ন টিম গঠন (Evaluation team) এবং প্রতি বৎসর ন্যূনতম একবার মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিমার্জন ও অনুমোদন;

(ঝ) কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচির সমস্যা নিরসন এবং এ লক্ষ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপ-এর আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন;

(ঞ) প্রকল্প বা কর্মসূচিসমূহ কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান;

(ট) গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানকল্পে নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঠ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(ড) এই ধারার অধীনে কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য করা;

(ঢ) কোন আর্থিক বৎসরে যথাযথ প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সম্ভব না হইলে অব্যবহৃত অর্থ তহবিলে স্থানান্তরকরণ;

(ণ) ট্রাস্টি বোর্ডের প্রয়োজনে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ;

(ত) সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

- ***কারিগরি কমিটির গঠন***

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০-এর ধারা ১২-এ *বলা হইয়াছে* ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: সচিব- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; জলবায়ু পরিবর্তন সেল-এর প্রতিনিধি বা ফোকাল পয়েন্ট; পরিকল্পনা উইং-এর প্রতিনিধি; পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রতিনিধি; বন বিভাগের একজন প্রতিনিধি; উপ-সচিব (পরিবেশ-১), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

এছাড়াও থাকবেন পরিবেশ অধিদপ্তর-এর দুইজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি (পরিচালক, কারিগরি); সরকার কর্তৃক মনোনীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্প বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান/এনজিও/বিশেষজ্ঞ-এর দুইজন প্রতিনিধি; Centre for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)-এর একজন প্রতিনিধি;

সচিব- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কমিটির আহবায়ক এর দায়িত্ব পালন করিবেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (পরিবেশ), উপ-সচিব কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন। মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

- **কারিগরি কমিটির কার্যাবলি**

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০-এর ধারা ১৩-এ বলা হইয়াছে কারিগরি কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ -

(ক) জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বার্ষিক বাজেট, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
(খ) ট্রাস্টের অর্থ দ্বারা গৃহিতব্য প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ও নীতিমালা প্রস্তুতকরণে ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা দান;
(গ) গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানকল্পে নীতিমালা প্রণয়নে ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা দান;
(ঘ) ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত কর্মসূচি বা প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও সুপারিশকরণ;
(ঙ) যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত প্রয়োজনে উপযুক্ত সাব-কমিটি গঠন;
(চ) ট্রাস্টি বোর্ডের চাহিদা অনুসারে সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা দান;
(ছ) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন; এবং
(জ) কারিগরি কমিটির প্রয়োজনে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ।

- **ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট**

ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনার জন্য বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি পৃথক ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট’ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এই ইউনিটটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও এনজিও দের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

- **জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ফান্ড**

  ৪টি মূল দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তা নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ফান্ড কাজ করে থাকে। এ সহযোগীতার পরিমাণ ইউকে ৯৪.৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার, ডেনমার্ক ১.৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার, সুইডেন ১৩.৬ ইউএস ডলার এবং ইওরোপিয় ইউনিয়ন ১১.৭ ইউএস ডলার। জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ফান্ড দুটি মাধ্যমে কাজ করে থাকে। বাজেটের মাধ্যমে সরকারি খাত সমূহের এবং বাজেট ছাড়া বেসরকারি খাতে গৃহিত প্রকল্প। সম্প্রতি মোট ফান্ডের ১০ ভাগ অর্থ বাজেট ছাড়া মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কমিউনিটির ম্যাকানিজম বৃদ্ধিও তাদের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহিত পরিকল্পনার মাধ্যমে কমিউনিটির জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ কাজের জন্য সরকারের পল্লি কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

- **পরিচালন পদ্ধতি ও কাঠামো**

  সরকার ও উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ফান্ডের বাস্তবায়নে ২০১১ সালে একটি ম্যানুয়্যাল চূড়ান্ত করা হয়। যেটি তিনটি স্তরবিশিষ্ট-

  ১। গভর্নিং কাউন্সিল;
  ২। ব্যবস্থাপনা কমিটি; এবং
  ৩। সেক্রেটারিয়েট।

- *গভর্নিং কাউন্সিল*

  ১৬ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং কাউন্সিল জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ফান্ডের কৌশলগত নির্দেশনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মকৌশল এবং পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করিতে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হইবে সভাপতি এবং একই মন্ত্রণালয়ের সচিব হইবে সদস্য সচিব। এ কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে দুইজন হইবে উন্নয়ন কর্মী, দুইজন হইবে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, খাদ্য ও দুর্যোগ, পররাষ্ট্র, কৃষি, নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি। এ কাউন্সিলের প্রাথমিক কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ-

  - বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনার (BCCSAP) লক্ষ্য অর্জনে দিক নির্দেশনা প্রদান;
  - জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ফান্ডের অধীন সকল প্রকল্প অনুমোদন;
  - বাৎসরিক পরিকল্পনা ও আর্থিক পরিকল্পনা জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প ও বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন;
  - এ ফান্ডের অধীন যে অর্জনগুলো হইয়াছে তা রিভিউ করা;
  - টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করা; এবং
  - ইভালুয়েশন টিমের দ্বারা বাৎসরিক ইভালুয়েশন প্রতিবেদনের দিক নির্দেশনা প্রস্তুত করা।

- *ব্যবস্থাপনা কমিটি:*

  ব্যবস্থাপনা কমিটি জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ফান্ডের অধীন পরিচালিত কার্যক্রমের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবে এবং এ এসকল কার্যক্রম ম্যানুয়্যাল অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে তা নিশ্চিত করা। এ কমিটির সভাপতিত্ব করিবেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব। ৯ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে থাকবে দুইজন ডোনার পার্টনার, একজন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি, এবং বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি। এ কমিটির প্রাথমিক দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ-

- *বাস্তবায়নকারী ম্যানুয়ালটি রিভিউ করা*

  পরিবর্তন সহনশীল ফান্ডের অধীন পরিচালিত কার্যক্রমের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনা রিভিউ করা।

- *সেক্রেটারিয়েট*

  সেকরেটারিয়েট পরবর্তীতে গঠন করা হইবে। বিশ্ব ব্যাংক জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ফান্ডের ট্রাস্টি হিসেবে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কাজ করিবে।

৬.২.৪. *দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২*

এদেশে দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাঠামো গড়ে তুলতে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, প্রণয়ন করা হয়। যেহেতু দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে এনে সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা, দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা, দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান করা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করাসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিধান করা প্রয়োজন বিবেচনায় এ আইন প্রণীত হয়। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- *জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল*

ধারা ৪(১)

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তিবর্গকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল থাকিবে ।

কাউন্সিলের সভাপতি হইবেন প্রধানমন্ত্রী। সদস্য-সচিব হইবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। সদস্য থাকিবেন স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী; কৃষি মন্ত্রী; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী; যোগাযোগ মন্ত্রী; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী; খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী; পানিসম্পদ মন্ত্রী; নৌ পরিবহন মন্ত্রী; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী।

এছাড়াও থাকিবেন সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর প্রধান । বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব সদস্য হিসেবে থাকিবেন। যেমন- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব; অর্থ বিভাগের সচিব; কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব; স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সচিব; খাদ্য বিভাগের সচিব; ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব-ইত্যাদি । এছাড়াও থাকিবেন বর্ডার গার্ড, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডএর মহাপরিচালক এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি।

- **কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি**

ধারা ৬

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতিমালা ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- বিদ্যমান দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম পদ্ধতি পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নপূর্বক উহার সংশোধন, পরিমার্জন বা পরিবর্তনের জন্য কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কমিটি ও ব্যক্তিবর্গকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান;
- দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম এবং উহার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কমিটি ও ব্যক্তিবর্গকে কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান;
- দুর্যোগ মোকাবেলা বা পুনর্বাসন বিষয়ে গৃহীত সরকারি প্রকল্প বা কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- দুর্যোগ সংক্রান্ত সকল বিষয়, কার্যাদি, নির্দেশনা, কর্মসূচি, আইন, বিধি, নীতিমালা, ইত্যাদি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা, ইত্যাদি আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রদান।

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:**

ধারা ৯

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা: -

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে আনিয়া সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা;
- দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমগুলিকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা সুপারিশ, ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা;
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা; এবং
- সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

- **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা:**

ধারা ১২(১)

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের উপর গবেষণা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার, প্রয়োজনে, একটি 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

- **জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন**

ধারা ১৩(১)

দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার জনগোষ্ঠীভিত্তিক একটি কর্মসূচি প্রণয়ন ও উহার অধীন জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন করিতে পারিবে।

- **জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ:**

ধারা ১৪(১)

ব্যাপক আকারের দুর্যোগের সময় সাড়াদান কার্যক্রম সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ গঠিত হইবে যথা:-

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী; স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার; সচিব- অর্থ বিভাগের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের, তথ্য মন্ত্রণালয়ের, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এই সমন্বয় গ্রুপের সভাপতি হইবেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সচিব সদস্য-সচিব হইবেন।

- **জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ**

ধারা ১৬

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- দুর্যোগ অবস্থা মূল্যায়ন এবং দুর্যোগ সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সচল করা;
- দুর্যোগে সাড়াদানের জন্য সম্পদ প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- সতর্ক সংকেতসমূহের যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করা;
- সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় করা;
- দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম তদারকি করা;
- দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা;
- টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় দ্রুত অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- ত্রাণ সামগ্রী, তহবিল ও যানবাহন বিষয়ক অগ্রাধিকার নিরূপণ ও নির্দেশনা প্রদান করা;
- দুর্যোগকালীন এলাকায় অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ প্রেরণ করা এবং যোগাযোগ ও সুবিধাদি প্রদানের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণের বিষয় সমন্বয় করা;
- দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় তথ্য প্রবাহ সচল রাখা;
- কাউন্সিল এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা এবং কাউন্সিলকে দুর্যোগ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা;
- বহু সংগঠনভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Multi-agency Disaster Incident Management System) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা;
- দুর্যোগের প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাস পদক্ষেপের বিষয়ে সুপারিশ করা;
- সম্পদ, সেবা, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসাবে চিহ্নিত ভবন, যানবাহন বা অন্যান্য সুবিধাদি হুকুমদখল বা রিক্যুইজিশন এর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা;
- মারাত্মক ধরনের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় বা মারাত্মক ধরনের দুর্যোগ ঘটিতে পারে এইরূপ অবস্থার অবনতির প্রেক্ষিতে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা সম্পদের যোগান, সরবরাহ বা ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট হইতে একসঙ্গে এক বা একাধিক বৎসরের জন্য দুর্যোগ-পূর্ব সময়ে আগাম ক্রয়ের বিষয়ে সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত সুপারিশ করা।

- **জাতীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি**

ধারা ১৭

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত কমিটি, বোর্ড ও প্লাটফরম থাকিবে, যথা:-

(ক) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি;
(খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি;
(গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি;
(ঘ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড;
(ঙ) ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতাবৃদ্ধি কমিটি;
(চ) ন্যাশনাল প্লাটফর্ম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন;
(ছ) দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি;

- **স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও গ্রুপ:**

ধারা (১৮)(১)

স্থানীয় পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে,যথা:

(ক) সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
(খ) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
(গ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
(ঘ) পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
(ঙ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি; এবং
(চ) প্রয়োজনে, দুর্যোগকালীন জেলা বা উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি।

ধারা (১৮)(২)

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ;
(খ) জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ;
(গ) উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ;
(ঘ) পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ।

দুর্গত এলাকা ঘোষণা ও করণীয়

- **দুর্গত এলাকা ঘোষণা**

ধারা ২২(১)

রাষ্ট্রপতি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, দেশের কোন অঞ্চলে দুর্যোগের কোন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা মোকাবেলায় অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অধিকতর ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয় রোধে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা জরুরি ও আবশ্যক, তাহা হইলে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে দুর্গত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন।

ধারা ২২(২):

কোন অঞ্চলে সংঘটিত মারাত্মক ধরণের কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত দুর্যোগের অধিকতর ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয় রোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি ও আবশ্যক হইলে স্থানীয় পর্যায়ের কোন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গ্রুপ বা সংস্থা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে দুর্গত এলাকা ঘোষণার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

ধারা ২২ (৩):

উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন সুপারিশ প্রাপ্ত হইলে জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে বিষয়টির যথার্থতা যাচাইপূর্বক উহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সুপারিশ গ্রহণ করত বিবেচ্য অঞ্চলকে দুর্গত এলাকা ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীন দুর্গত এলাকা ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইলে উহার মেয়াদ অনধিক ২ (দুই) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে যদি না উক্ত মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উহা হ্রাস, বৃদ্ধি বা প্রত্যাহার করা হয়।

- ***দুর্গত এলাকা সংক্রান্ত বিশেষ করণীয় কার্যাবলি***

ধারা ২৩(১)

কোন অঞ্চলকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করা হইলে সরকার, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থা এবং এই আইনের অধীন গঠিত কমিটিসমূহকে জরুরি ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত বিশেষ করণীয় কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

- দুর্যোগ অবস্থা মোকাবেলায় দুর্গত এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি মজুদে থাকা সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
- প্রয়োজনে অতিরিক্ত সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
- জননিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ;
- জান-মাল ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ।

- **দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা**

ধারা **২৭(১)**

সরকার, বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য বা ঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে অতিদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষত বয়োবৃদ্ধ, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা ও ঝুঁকিহ্রাসকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

ধারা **২৭**(২)

দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি সাড়া প্রদান বা মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী বা ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদাপন্ন হইলে, তাহাদের উপযুক্ত পুনর্বাসন বা ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
[ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী অর্থে আর্থ-সামাজিক ও নানাবিধ সুবিধা হইতে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত হইবে]

- **দুর্যোগ পরিস্থিতির তথ্য সম্পর্কে করণীয়**

ধারা ২৮

জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের কোন কমিটির সভাপতি বা কোন সদস্য যদি স্বয়ং বা কোন ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক অবহিত হইয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন এলাকায় দুর্যোগ পরিস্থিতি আসন্ন, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অবহিত করিবেন।

- **অনিয়ম, গাফিলতি বা অব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভিযোগ, আপিল**

ধারা ২৯
দুর্যোগ আক্রান্ত কোন ব্যক্তি, পরিবার বা জনগোষ্ঠীর নিকট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন অনিয়ম, গাফিলাতি বা অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হইলে তিনি বা তাহারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের কোন কমিটির নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনে তদন্তপূর্বক, সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবে।

কোন কমিটির কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি, জাতীয় পর্যায়ের কোন কমিটির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, সরকারের নিকট এবং স্থানীয় পর্যায়ের কমিটির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে সরকার বা, ক্ষেত্রেমত, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

- **জরুরি সাড়া প্রদান কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ**

ধারা ৩০
মারাত্মক ধরনের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় অথবা মারাত্মক ধরনের দুর্যোগ ঘটিবার আশঙ্কার প্রেক্ষিতে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দিলে উক্ত ক্ষেত্রে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ এর নিকট হইতে কোন সুপারিশ প্রাপ্ত হইলে সরকার সে মোতাবেক দুর্যোগপূর্ব বা দুর্যোগকালীন জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে বেসামরিক প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

স্থানীয় পর্যায়ে মারাত্মক ধরনের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় অথবা মারাত্মক ধরনের দুর্যোগ ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ কার্যকরভাবে মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দিলে, জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ এর নিকট হইতে কোন সুপারিশপ্রাপ্ত হইলে জেলা প্রশাসক তদ্‌ভিত্তিতে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা চাহিয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিকট চাহিদাপত্র প্রেরণ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে জেলা প্রশাসক, জরুরি প্রয়োজেনে, স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃপক্ষের নিকট সরাসরি সহযোগিতা চাহিতে পারিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে যথাশীঘ্র সম্ভব বিষয়টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে লিখিতভাবে, ফ্যাক্স বা ই-মেইল মারফতে অবহিত করিবেন।

- **গণমাধ্যম ও সম্প্রচার কেন্দ্রের প্রতি নির্দেশনা**

ধারা ৩৪
এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, যে কোন রেডিও বা বেতার, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল, মুদ্রণ মাধ্যম, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা ইলেকট্রনিক বা কেবল নেটওয়ার্ক অথবা এইরূপ তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর সম্প্রচার মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আসন্ন দুর্যোগাবস্থা, দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট

আগাম সতর্ক সংকেত বা দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক বা জনসচেতনতামূলক তথ্য, চিত্র বা সংবাদ ইত্যাদি প্রচার, প্রকাশ ও প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি উক্তরূপ নির্দেশনা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে । কোন ব্যক্তি যদি ধারা ৩৪ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ অমান্য করেন বা অমান্য করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জরুরি করণীয়**

ধারা ৩৫

তফসিলে উল্লেখিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জরুরি করণীয় সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সংশ্লিষ্ট সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উহাতে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশাবলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবার লক্ষ্যে সরকারকে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিতে হইবে।

ধারা ৪৩

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশাবলি অমান্যের শাস্তি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

- **দুর্গত এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দণ্ড**

ধারা ৪০

দুর্গত এলাকায় যদি কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করেন বা বৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

- **লবণাক্ততা বা প্লাবন সৃষ্টি করা বা চলমান পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা বা বাঁধের ক্ষতিসাধন, ইত্যাদির দণ্ডঃ**

কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা অবহেলায় কোন এলাকায় লবণাক্ততা বা প্লাবন সৃষ্টি করেন অথবা সুইচ গেটের চলমান কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করেন বা ক্ষতি সাধন করেন অথবা পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন অথবা বাঁধের ক্ষতি করিয়া বা বাঁধ কাটিয়া দুর্যোগ অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে জানমালের ক্ষতি করেন বা অনুরূপ কার্য সংঘটনে প্রচেষ্টা করেন বা সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর কিন্তু অন্যূন ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন (ধারা ৪১)।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত কোন ব্যর্থতা বা লঙ্ঘনের অভিযোগে কোন সরকারি কর্মচারী দায়ী হইলে তিনি সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আচরণ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অপরাধে অভিযুক্ত হইবেন এবং উক্ত কারণে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল**

ধারা ৩২(১)
এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল' এবং 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল' নামে দুইটি পৃথক তহবিল গঠন করিবে।

ধারা ৩২(২)
নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোন বিদেশি সরকার, সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ঘ) স্থানীয় পর্যায়ের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত দান;
(ঙ) অন্য কোন বৈধ উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

ধারা ৩২ (৩)
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলে জমাকৃত অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন রাষ্ট্রায়ত্ত তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

ধারা ৩২ (৪)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল' পরিচালিত হইবে এবং উক্ত বিভাগের সচিব ও যুগ্ম সচিব (ত্রাণ) এর যৌথ স্বাক্ষরে উহার ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

ধারা ৩২ (৫)
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল' পরিচালিত হইবে এবং জেলা প্রশাসক ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে উহার ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

ধারা ৩২ (৬)
'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল' এবং 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল' এর পরিচালনার পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে উক্ত তহবিলসমূহ পরিচালনা ও উহাদের অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

ধারা ৩২ (৭)
দুর্যোগকালে বা দুর্যোগের অব্যবহিত পরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সরাসরি বৈদেশিক ত্রাণ বা অন্যান্য সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, বিষয়টি, প্রয়োজন অনুযায়ী, পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

ধারা ৩২ (৮)
এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, উপ-ধারা (১) এর অধীন তহবিল গঠন ছাড়াও কেন্দ্রীয় ত্রাণ ভাণ্ডার ও জেলা ত্রাণ ভাণ্ডার স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

ধারা ৩২
(৯) উপ-ধারা (৮) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত উপ-ধারার অধীন কেন্দ্রীয় ত্রাণ ভাণ্ডার স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, বিদ্যমান কেন্দ্রীয় ত্রাণ ভাণ্ডার এবং উহার জেলা পর্যায়ের গুদামসমূহের পরিচালনা অধিদপ্তর কর্তৃক এমনভাবে অব্যাহত রাখা যাইবে যেন উহা এই আইনের অধীন স্থাপিত ও পরিচালিত হইতেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

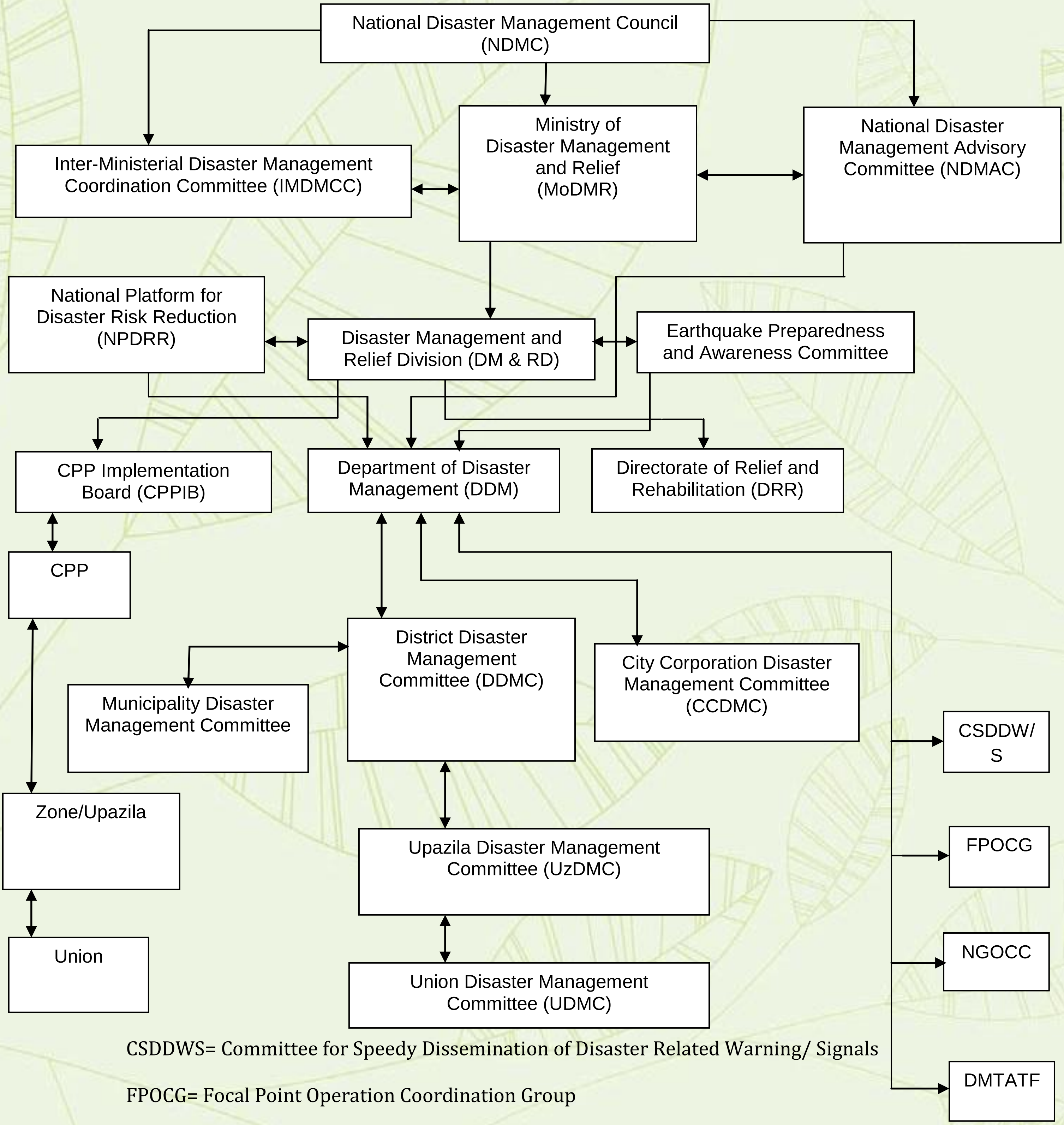

CSDDWS= Committee for Speedy Dissemination of Disaster Related Warning/ Signals

FPOCG= Focal Point Operation Coordination Group

NGOCC= NGO Coordination Committee on Disaster Management

DMTATF= Disaster Management Training and Public Awareness Building Taskforce

তথ্যসূত্র: **Standing Orders on Disaster, 2010**

৬.৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

আইন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০	ট্রাস্টি বোর্ড
	টেকনিক্যাল কমিটি
	সাব-টেকনিক্যাল কমিটি
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
	জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন
	জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ
	জাতীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি: জাতীয় পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত কমিটি, বোর্ড ও প্লাটফরম থাকিবে:- (ক) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি; (খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি; (গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি; (ঘ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড; (ঙ) ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতাবৃদ্ধি কমিটি; (চ) ন্যাশনাল প্লাটফর্ম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন; (ছ) দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি।
	স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি: (ক) সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি; (খ) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি; (গ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি; (ঘ) পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি; (ঙ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি; এবং (চ) প্রয়োজনে, দুর্যোগকালীন জেলা বা উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি।
	স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় গ্রুপ (ক) সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ; (খ) জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ; (গ) উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ; (ঘ) পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ।

৬.৪ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ বিচারিক ব্যবস্থা

৬.৪.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

ধারা ৪৫

জেলা প্রশাসক বা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করিবে না।

ধারা ৪৭

এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার এবং আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশাবলি অমান্য করলে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারে বিচার্য হইবে।

৬.৪.২ মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত দাবিঃ

ধারা ৪৯(১)

কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃত বা অবহেলাক্রমে যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন কার্য দ্বারা পরিবেশের এইরূপ বিপর্যয় ঘটান যাহা কোন দুর্যোগের কারণ সৃষ্টি করে এবং ফলশ্রুতিতে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জান, মাল, সম্পদ, স্থাপনা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি সাধিত হয়, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

ধারা ৪৯ (২)

এই ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা পরিচালনায় The Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

সপ্তম অধিবেশন	*পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং নারীর অংশগ্রহণ: আইন ও নীতি, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিচারিক ব্যবস্থা*

উদ্দেশ্য ঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ

১. পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এবং নারীর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত আইন, বিধি, নীতি, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে;
২. এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কারা? পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব কী?
৩. এছাড়া পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় কিভাবে নারীরা ভূমিকা রাখতে পারে এবং বিভিন্ন আইন ও নীতিমালায় নারীকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হইয়াছে তার একটি ধারণা পাবেন।

উপকরণ ঃ হ্যান্ডআউট, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার পেন, পোস্টার, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন।

সময় ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ

প্রশিক্ষক এই অধিবেশনে-

- প্রথমে পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, বন, মৎস্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ও নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিবেন;
- এরপর এর সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতি সমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরবেন এবং আলোচনা করবেন;
- আইন, বিধি ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ /প্রতিষ্ঠান সমূহ, তাদের কাঠামো ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দিবেন;
- এবং আইন, বিধি সমূহ ভঙ্গ হলে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা, ক্ষতিগ্রস্থের জন্য প্রতিকার ও দোষী ব্যক্তির জন্য শাস্তি বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন।

৭.১ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

- **স্থানীয় সরকার :**

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বহুদিন যাবত চলে আসছে। বিভিন্ন সময় বিভিণ্ন আইনের অধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছে। ব্রিটিশ আমালে চৌকিদারি আইন, ১৮৭০-এর অধীন স্থানীয় সরকার কাজ

করিতো। এ আইনের বিধান অনুযায়ী বেশকিছু গ্রাম একত্রিতভাবে একটি ইউনিয়ন গঠন করা হতো। প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে চৌকিদারি পঞ্চায়েত থাকতো। পরবর্তীতে ১৯৫৯ সালে বেসিক ডেমোক্রাসি আদেশের বলে চারটি পর্যায়ে অর্থাৎ ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং বিভাগীয় কাউন্সিল-এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কাজ করিতো। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ হিসেবে স্থানীয় সরকার কাজ করে থাকে।

- **পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সরকার ভূমিকা :**

স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব আইন দ্বারা নির্ধারিত রয়েছে। আইন অনুযায়ী একজন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি তার এলাকার পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে যে যে স্থানীয় সরকার যে এলাকার জন্য প্রযোজ্য সে উক্ত এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। স্থানীয় সরকার দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে কারণ এ সংস্থা জনগণের সবচেয়ে কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। ফলে জনমতের প্রতিফলন ঘটিয়ে বা জনগণকে সাথে নিয়ে নিজ নিজ এলাকার পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭.২ *পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার: আইনি বিধানসমূহ*

দেশে বর্তমানে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯; স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯; এবং উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ দ্বারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে।

৭.২.১ *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯*

আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো আলোচনা করা হলো-

- ***ওয়ার্ড সভা এবং পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা***

এ আইনের বিধান অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড সভা থাকিবে। এ আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ দূষণ রোধ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা ওয়ার্ড সভার কাজ। ধারা ৭ অনুযায়ী ওয়ার্ড সভার দায়িত্ব হচ্ছে-বৃক্ষরোপণ করা, পরিবেশ উন্নয়ন করা ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা। সেইসাথে প্রাকৃতিক দুযোর্গ মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণ করাও এ সভার দায়িত্ব।

- ***স্থায়ী কমিটি এবং পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা***

ধারা ৪৫ অনুযায়ী পরিষদের কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য নিম্নোক্ত প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি করে স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে-

- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়নমূলক কাজ;
- স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন;
- সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; এবং
- পরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ।

- ***প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি***

এ আইনের ২য় তফসিলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি বর্ণনা করা হইয়াছে যার মধ্যে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরূপ-

- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি স্থান, উন্মুক্ত স্থান উদ্যান ও খেলার মাঠ হেফাজত করা;
- বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ চুরি ও ধ্বংস প্রতিরোধ; এবং
- জলাধার, পুকুর এবং পানি সরবরাহের উৎস ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।

৭.২.২ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮

উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদের ন্যায় উপজেরা পরিষদ আইন, ১৯৯৮-এর দ্বিতীয় তফসিলে উপজেলা পরিষদের নিম্নরূপ কার্যাবলি প্রদান করা হইয়াছে

- **উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি *এবং পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা***

ধারা ২৩:

১। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা প২িরষদ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
২। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ;
৩। স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪। মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন করা;
৫। কৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং
৬। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

৭.৩ স্থানীয় সরকার এবং বিচারিক ব্যবস্থা:

৭.৩.১ *গ্রাম আদালত আইন*, ২০০৬

ধারা ৫

(১) একজন চেয়ারম্যান এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন করে মোট চারজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন সদস্যকে সংশ্লিষ্টইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হইতে হইবে।

তবে আরো শর্ত থাকে যে, তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারি মামলার সহিত নাবালক এবং তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার সহিত কোন নারীর স্বার্থ জড়িত থাকিলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে একজন নারীকে সদস্য হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

(২) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হইবেন, তবে যেক্ষেত্রে তিনি কোন কারণবশত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ্য হন কিংবা তাঁহার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে

কোন পক্ষ কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেইক্ষেত্রে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সদস্য ব্যতীত উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোন সদস্য গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হইবেন।

(৩) বিবাদের কোন পক্ষে যদি একাধিক ব্যক্তি থাকেন, তবে চেয়ারম্যান উক্ত পক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণকে তাহাদের পক্ষের জন্য দুইজন সদস্য মনোনীত করিতে আহ্বান জানাইবেন এবং যদি তাঁহারা অনুরূপ মনোনয়নদানে ব্যর্থ হন তবে তিনি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে হইতে যে কোন একজনকে সদস্য মনোনয়ন করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং তদানুযায়ী অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন বিবাদের কোন পক্ষ চেয়ারম্যানের অনুমতি লইয়া ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রাম আদালতের সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতে পারিবে।

ধারা ৬
গ্রাম আদালতের এখতিয়ার:

(১) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, বিবাদের পক্ষগণ সাধারণত সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে, উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, গ্রাম আদালত গঠিত হইবে এবং উক্তরূপ মামলার বিচার করিবার এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতের থাকিবে।

(২) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, বিবাদের একপক্ষ সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে এবং অপরপক্ষ ভিন্ন ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে, যে ইউনিয়নের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, সেই ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হইবে; তবে পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে নিজ ইউনিয়ন হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবে।

ধারা ৭
গ্রাম আদালতের ক্ষমতা

গ্রাম আদালত তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং গ্রাম আদালত তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোন মামলায় অনুরূপ বিষয়ে তফসিলে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে বা সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি বা এর দখল প্রত্যার্পণ করার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারে।

গ্রাম আদালত আইনের ধারা ১৩ অনুযায়ী The Evidence Act, 1872 (Act No. 1 of 1872) ও ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি এবং দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১০ ও ১১ ব্যতীত অন্যান্য বিধানাবলি গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং গ্রাম আদালতে আনীত সকল মামলার ক্ষেত্রে The Oaths Act, 1873 (Act No. X of 1873) এর ধারা ৮, ৯, ১০ ও ১১ প্রযোজ্য হইবে।

৭.৩.২ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯

ধারা ৯০

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা নির্ধারিত কোন ব্যক্তি এ আইনের অধীন অপরাধসমূহের আপোষ করিতে পারে।

ধারা ৯১

পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতিত কোন আদালত এ আইনের অধীনে কোন অপরাধের বিচারার্ধ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্থানীয় সরকারের কোন কর্মকাণ্ডের ফলে বা কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা না করার ফলে কোন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার খর্ব হলে সে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের বলে উচ্চ আদালতে রিট মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৭.৩.৩ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮

ধারা ৫৯

অভিযোগ প্রত্যাহার ও আপোষ নিষ্পত্তি

চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এ আইনের অধীনে অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার বা অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে আপোষ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

৭.৪ স্থানীয় সরকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো :

আইন	প্রতিষ্ঠান
গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬	স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ।
স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯	স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ।
উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮	স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং উপজেলা পরিষদ।

৭.৫ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নারীর ভূমিকা এবং আইন ও নীতি

- **পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নারীর ভূমিকা**

আদিকাল থেকে এদেশে নারীকে প্রকৃতির সংরক্ষণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এদেশের বেশির ভাগ মানুষই প্রকৃতি থেকে জীবিকা অর্জন করে। চাষাবাদ, গবাদি পশু প্রতিপালন, উন্মুক্ত জলাশয় থেকে মাছ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ প্রায় সমান। কখনও কখনও নারীর অংশগ্রহণ অনেকাংশে বেশি। বীজ সংগ্রহ, শস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পারিবারিক পুষ্টির সরবরাহ, পানীয় জল সংগ্রহ এসবই নারীর প্রাথমিক দায়িত্ব। এ কাজগুলোর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের কাজটা নারী করে থাকে কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়া।

- **প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারীর অবস্থান:**

বাংলাদেশের মত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশে নারীর অবস্থান শোচনীয়। যে কোন দুর্যোগে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী। তবুও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসনে নারীর ভূমিকা ও প্রয়োজন উপেক্ষিত। যে কোন ঘূর্ণিঝড়ে বা প্রলয়ংকরী বন্যায় সর্বস্ব হারানো নারীর অসহায়ত্ব কল্পনাতীত। রাষ্ট্রীয় সহায়তার অভাবে খাদ্য, অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, জীবিকা সব মৌলিক দাবিই তার কাছে হয়ে পরে অর্থহীন। এখানে আইলা ও

সিডরের কথা উল্লেখ করা যায়। যত মৃত্যু ঘঠেছে তার বেশিরভাগই ছিল নারী। এখানেই শেষ নয় যারা বেঁচে থেকেছে তাদেরকে সহ্য করিতে হইয়াছে অবর্ণনীয় কষ্ট। এ নারীকে সাঁতরে খাবার পানি সংগ্রহ করিতে দেখা গিয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়েছে মানবেতর অবস্থায়। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে নারীর কথা বলা হচ্ছে।

- **পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ: আইন ও নীতিসমূহ**

বিশ্ব জুড়ে পরিবেশগত ন্যায় বিচার সুরক্ষায় নারীর অংশগ্রহণকে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এদেশের সংবিধান; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২; বন নীতি, ১৯৯৪; খাদ্য নীতি, ২০০৬; পানি নীতি, ১৯৯৯ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নারী ও পরিবেশের সম্পর্কের উপর জোর দেয়া হইয়াছে। নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নারীর অংশ গ্রহণের ও তার মতামত প্রতিফলনে সমান সুযোগ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দেয়া হইয়াছে। পরিবেশ দূষণরোধে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করিতে বলা হইয়াছে। নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার নারীর পুনবার্সনের ব্যবস্থা নেয়া হইবে এবং কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশু ও বন ব্যবস্থাপনায় নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির কথাও আছে এ নারী নীতিতে।

৭.৫.১ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২*

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(৩) এ বলা হইয়াছে রাষ্ট্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(১) এ বলা হইয়াছে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন বৈষম্য করা যাইবে না। অনুচ্ছেদ ২৮(২)-এ বলা হইয়াছে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবে। অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-এ বলা হইয়াছে নারী বা শিশুদের অনুকূলে বা নাগরিকের যে কোন অনগ্রসর অংশের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। অনুচ্ছেদ ২৯(২)-এ বলা হইয়াছে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবে না বা সেক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

৭.৫.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

ধারা ২৭ (১)

সরকার, বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য বা ঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে অতিদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষত বয়োবৃদ্ধ, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা ও ঝুঁকিহ্রাসকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৭.৫.৩ বননীতি, ১৯৯৪

বননীতি ১৯৯৪ এর পূর্বশর্ত ৩-এ বলা হইয়াছে বন খাতের উন্নয়নে বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মহিলাসহ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৃক্ষচাষি বন ব্যবহারকারী এবং যাহাদের জীবিকা বন ও বনভূমির উপর নির্ভরশীল তাহাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে। বননীতি ১৯৯৪ এর ঘোষণা ২২-এ বলা হইয়াছে গৃহাঙ্গন ও খামারভিত্তিক গ্রামীণ বনায়ন এবং অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বনায়ন কার্যক্রম মহিলাদের বর্ধিতহারে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হইবে।

৭.৫.৪ জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা, ২০০৪

জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা, ২০০৪-এর ৪.২ নং পরিকল্পনায় জেন্ডার ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রথাগতভাবে নারীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১২০০ বছর আগে থেকেই বীজ বাছাই, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে নারীরা পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেছে। নারীরাই প্রথম গ্রামীণ বনায়নের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। তাই তারা প্রথাগতভাবেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নারীরা জ্ঞানসমৃদ্ধ। অধিকিন্তু পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নারীর ভূমিকা হতে পারে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ও টেকসই পদক্ষেপ এ উপলব্ধি থেকেই বাংলাদেশের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) নীতি সংযোজনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

৭.৫.৫ সামাজিক বনায়ন বিধি, ২০০৪
স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের পদ্ধতি

বিধি ৫ক
বন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং আবেদনকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যূনতম দুইজন প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে অন্তত একজন মহিলা থাকিবেন, সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) অনুযায়ী উপকারভোগীদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

৭.৫.৬ বনাঞ্চল সহ-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, ২০০৯
বনাঞ্চল সহ-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, ২০০৯ (প্রজ্ঞাপন নং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮): অনুচ্ছেদ ২.১ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সর্বোচ্চ ৬৫ জন সদস্য থাকিবে। তারমধ্যে ন্যূনতম ১৫ জন মহিলা সদস্য থাকিবেন। অনুচ্ছেদ ৩.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co-management Committee) : সদস্যদের মধ্যে ন্যূনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকিবে।

৭.৫.৭ মৎস্য নীতি, ১৯৯৮
মৎস্য নীতি ৬.৩ এ বলা হইয়াছে মৎস্য চাষে মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ ও তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হইবে এবং মৎস্য নীতি ৬.৪.১ এ বলা হইয়াছে সরকারি খাস দিঘি, পুকুর কিংবা অন্যান্য জলাশয় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিত্তহীন প্রান্তিক চাষি ও গরিব মৎস্যচাষি, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার যুবক/যুব মহিলা ও লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হইবে। দরপত্র লব্ধ আয়ের অর্থ নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে সরকারি খাতে কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ তহবিলে জমা হইবে।

৭.৫.৮ জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯
জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯-এর ৩খ নং উদ্দেশ্য দরিদ্র ও অনগ্রসর অংশসহ সমাজের সবার জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং নারী ও শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দেয়া। এ নীতিমালার নীতি ৪.৫ ঙ এ বলা হইয়াছে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারী এবং নিম্ন আয়ের পানি ব্যবহারকারীদের স্বার্থ পর্যাপ্তভাবে সংরক্ষণ করা।

৭.৫.৯ Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009

Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 এর ছয়টি থিমের প্রথম থিমে বলা হইয়াছে **খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য** নিশ্চিত করা যাতে দরিদ্রতম এবং নারী ও শিশুসহ সমাজের সবচেয়ে দুস্থ লোকজন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকে । এ থিমের আওতায় প্রস্তাবিত সকল কর্মসূচিতে এই জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ গৃহায়ন, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যসহ মৌলিক সেবাসমূহ পাওয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়া হইয়াছে।

৭.৫.১০ Bangladesh Poverty Reduction Strategy Paper, 2009

Bangladesh Poverty Reduction Strategy Paper, 2009 এর অনুচ্ছেদ ৩.৩৩-এ বলা হইয়াছে নারীদের ক্ষমতায়ন এবং অবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে নারীদের শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। জাতীয় সংসদ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য নিরসনে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

সমাপ্তি অধিবেশন	আইন জিজ্ঞাসা, প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও সমাপ্তি ঘোষণা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাটিতে আলোচিত বিভিন্ন আইন, নীতি ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাবেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটির সবল ও দুর্বল দিক সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটির পরবর্তী উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করিতে পারবেন।

উপকরণ ঃ ফ্লিপ চার্ট, বোর্ড, মার্কার পেন, পোস্টার, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ দলভিত্তিক আলোচনা ও তা উপস্থাপন।

সময় ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

প্রক্রিয়া ঃ অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, Participatory Rapid Evaluation Method।

আইন জিজ্ঞাসা ঃ এই অধিবেশনে সহায়ক সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলবেন যে, আমরা এই দুইদিন যে সকল আইন নীতি ও বিচার বাবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকলে আমরা এখন তা আলোচনা করিতে পারি। অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রশ্ন থাকলে সহায়ক প্রশ্ন গুলো বোর্ডে লিখবেন এবং পর্যায়ক্রমে উত্তর গুলো দিবেন। যদি কোন প্রশ্নের উত্তর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে কেউ বলতে পারেন সেটাই প্রথমে সহায়ক বলার সুযোগ দিবেন এবং প্রয়োজনে নিজে বলবেন। এইভাবে সহায়ক আইন জিজ্ঞাসা অধিবেশনটি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন ।

সম্ভাব্য প্রশ্ন ঃ সংরক্ষিত বন ঘোষণা প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব প্রাপ্ত বন কর্মকর্তার করণীয় কী এবং সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান কী ?
পরিবেশ আদালত ও গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া কী ?

প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ঃ এই অধিবেশনে সহায়ক সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলবেন যে, আমরা এই দুইদিন ধরে যে প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি পরিচালনা করলাম তার কোন কোন দিক/ক্ষেত্র গুলো মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন । অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ থেকে যে প্রত্যাশা ছিল তা কতটা পূরণ হয়েছে? এবং আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণটি উন্নত করার সুযোগ রয়েছে? সহায়ক পর্যায়ক্রমে মতামত শুনবেন এবং প্রয়োজনে বোর্ডে লিখবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মূল্যায়ন শিট (সংযুক্তি) বিতরণ করবেন এবং তা অংশগ্রহণকারীগণ পূরণ করবেন। সহায়ক মূল্যায়ন শিট গুলো সংগ্রহ করবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন ।

সমাপ্তি ঘোষণা ঃ সহায়ক সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন ।

Participatory Rapid Evaluation
(Sample Sheet)

Participant No

SL No.	Areas	Scale				
		1	2	3	4	5
01.	Achievement of training objective					
02.	Effectiveness of course facilitation					
03.	Level of learning environment					
04.	Use of training methods					
05.	Tools of techniques					
06.	Usefulness of reading materials					
07.	Sufficiency of class room facilities					
08.	Usefulness and Relevance of course contents					
09.	Qualities of overall management					
10.	Fears of the participants					
11.	Involvement of participants					
12	Food, accommodation and logistics					
13	Recommendations for further development					

সহযোগী বইয়ের তালিকা

Department of Environment, 2003, A Compilation of Environmenal Laws administered by the Department of Environment. BEMP

DLR, 2007, The General Clauses Act, Chowdhury, Huq, Esrarul, Dhaka

Farooque, Mohiuddin, 1997, Law and Custom on Forests in Bangladesh: Issues and Remedies. BELA

Farooque, Mohiuddin. 1997, Regulatory Regime on Inland Fisheries in Bangladesh: Issues and Remidies. BELA

Farooque, Mohiuddin and Hasan, S, Rizwana, 2004, Laws Regulating Environment in Bangladesh. BELA

MoEF, 1992, Forestry Sector Master Plan, 1993-2012

Halim, Abdul, Mohammad, 2014. Legal System of Bangladesh, CCB Foundation

Hasan, S, Rizwana and Sultana, Zakia, 2009, Laws in protection of Forest, Forest Dwellers and Wildlife, BELA

Hasan, S, Rizwana and Sultana, Zakia, 2014. Supreme Court on Wetland Conservation, BELA

Hasan, S, Rizwana and Islam, Taslima, 2005. Judicial Decision on Environment in South Asia, Ministry of Forest and Environment, Government of Bangladesh, BELA, UNDP

Hasan, S, Rizwana and Khan, Hafijul I, 2011, Community Based Adaptation: Access and Justice Issues. Policy Brief, BELA.

Huq, Zahirul. 2008. Law and Practice of Criminal Procedure. Bangladesh Law Book Company.

Islam, Mahmudul. 2003. Constitutional Law of Bangladesh. Mullick Brothers

J. Rabbani, Gholam, Mohammad. 2008. Code of Civil Procedure: Concept, Comment and Case, DLR.

Huq, Samsul, Mohammad, 2007, Land Administration Management, Boighar, Dhaka.

Khan, M. Hafijul Islam (Eds) 2004, Policy Brief on “Strong Legal and Policy Measures Can Substantially Promote Poor and Vulnerable People’s Access to Common Resources”, Oxfam.

ইসলাম, তাজুল, আহমেদ (সম্পাদনা), ২০০৯, জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাবঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার।

ওয়াহাব এম. এ, ২০১২, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ঃ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা, ইউএসএআইডি’র আইপ্যাক প্রকল্প।

বাংলা একাডেমি, ২০১২, প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম।

রহমান, আতিউর (সম্পাদনা), ২০০৫, জনপ্রতিবেদন ২০০২-০৩ বাংলাদেশের পরিবেশ,পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়, উন্নয়ন সমন্বয়।